وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ ক্বাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘আমি আশা করছি, আশূরার দিনের ছিয়ামকে আল্লাহ তাআলা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩৮)।

●৭ম বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● জুলাই ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٧، ذو الحجة و محرم ١٤٤٥ هـ / يوليو ٢٠٢٣م العدد: ٩، الجزء : ٨١
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

আল-মুছতাফা মসজিদ, শারম আল-শেখ, মিশর : মিশরের পর্যটন নগরী শারম আল-শেখে নামা উপসাগরের উপকূলে অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদটি ২০০৮ সালে নির্মিত হয়। মসজিদটিতে ৭৬ মিটার উচ্চতার দুটি সুউচ্চ মিনার ও একটি বৃহদাকার গম্বুজ রয়েছে। উসমানী ও মামলূক স্থাপত্যশৈলিতে নির্মিত মসজিদটিতে একসাথে ৩০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদের বাইরের অংশ খোদাই করা পাথরে মোড়ানো আর অভ্যন্তরভাগ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সুসজ্জিত।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪-৪৫ ‖ ঈসায়ী ২০২৩ ‖ বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জুলাই	১২ যুলহিজ্জাহ	শনিবার	০৩ : ৪৭	০৫ : ১৪	১২ : ০২	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৫ ,,	১৬ ,,	বুধবার	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
১০ ,,	২১ ,,	সোমবার	০৩ : ৫২	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
১৫ ,,	২৬ ,,	শনিবার	০৩ : ৫৪	০৫ : ২০	১২ : ০৪	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৪
২০ ,,	০১ মুহাররম	বৃহস্পতিবার	০৩ : ৫৭	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১২
২৫ ,,	০৬ ,,	মঙ্গলবার	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৬	০৮ : ০৯

সূত্র : **মুসলিম প্রো** (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	-২	-২	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-১	০
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৫
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৪	+১
মাদারীপুর	+৩	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+২
শেরপুর	-২	-১	+৪
জামালপুর	-২	-১	+৫
নেত্রকোনা	-৫	-৩	+২

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৮
কক্সবাজার	-২	-৫	-১১
খাগড়াছড়ি	-৪	-৫	-৭
রাঙ্গামাটি	-৩	-৫	-৯
বান্দরবান	-২	-৪	-১০
কুমিল্লা	-২	-২	-৪
নোয়াখালী	+১	০	-৫
লক্ষীপুর	+২	+২	-৩
চাঁদপুর	+১	+১	-২
ফেনী	-১	-২	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৩
সুনামগঞ্জ	-৮	-৭	-১
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৬	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৭	+১১
নাটোর	+৪	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+১	২	+৪
বগুড়া	+১	+২	+৭
নওগাঁ	+৩	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+২	+৩	+৯

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-২	০	+৯
দিনাজপুর	-১	+৩	+১২
গাইবান্ধা	-১	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-৩	-১	+৯
লালমনিরহাট	-৩	-১	+৯
নীলফামারী	-১	+১	+১২
পঞ্চগড়	০	+১	+১৪
ঠাকুরগাঁও	+১	+২	+১৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৬	+১
বাগেরহাট	+৬	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৮	+৩
যশোর	+৭	+৭	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৫	+৩
নড়াইল	+৬	+৫	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৫	+৪	-৩
পিরোজপুর	+৬	+৫	-১
ঝালকাঠি	+৫	+৪	-১
ভোলা	+৩	+২	-৩
বরগুনা	+৭	+৫	-২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭ম বর্ষ
৯ম সংখ্যা
জুলাই ২০২৩
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০
যুলহিজ্জাহ-মুহাররম
১৪৪৪-৪৫

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দারসে হাদীছ**
  - » পরকালকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের সুফল — *-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল* ০৩
- **প্রবন্ধ**
  - » আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-১৪) — *মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী; অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী* ০৬
  - » ইসলামে কথা বলার নীতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ — *-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ* ১০
  - » অহীর বাস্তবতা বিশ্লেষণ-২০তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২৭তম পর্ব) — *-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক* ১৩
  - » যুবসমাজের অধঃপতনের কারণ ও উত্তরণের উপায় — *-মাহবুবুর রহমান মাদানী* ১৭
  - » বিদআতী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে দান-ছাদাক্বা করা প্রসঙ্গে ইসলাম কী বলে? — *-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন* ২০
  - » গাদীরে খুম ও আশূরায়ে মুহাররম — *-শেখ আহসান উদ্দীন* ২৩
  - » কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা — *-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক* ২৭
  - » থিংকিং ডিসকোর্স — *-মাযহারুল ইসলাম* ২৯
- **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
  - » চোগলখোরি ও তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব — *-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ* ৩২
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  - » ফেসবুকে আপনি কোন পথে যাচ্ছেন — *-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী* ৩৫
- **ইতিহাসের পাতা থেকে**
  - » ভ্রান্ত সুন্নীদের গুরু আহমাদ রেজা খানের ইতিহাস — *-সাঈদুর রহমান* ৩৭
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
  - » অবুঝ শিশুর কাছে বাবার প্রত্যাশা — *-এম কাউছার হামিদ* ৪০
- **কবিতা** ৪১
- **সংবাদ** ৪২
- **সওয়াল-জওয়াব** ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

১ জুন বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় জাতীয় সংসদে দেশের ৫২তম বাজেট পেশ করা হয়। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে ৭ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকার বাজেটটি ঘোষণা করেন। এবার বাজেটের প্রতিপাদ্য ছিল— ‘উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে’।

প্রস্তাবিত এ বাজেটটির আকার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৩৪ শতাংশ বড়। এবারের বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ঘাটতি মেটাতে বৈদেশিক উৎস থেকে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাজেট সরকার ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের দলীল। বাজেটে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার, কীভাবে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? কীভাবে সংকট নিরসন করা হবে? তাজউদ্দীন আহমেদের পেশকৃত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের শেষের দিকে সুন্দর করে হিসাব দেওয়া ছিল, কোন খাতে কত টাকা আয় হবে এবং কত ব্যয় হবে? অর্থনীতিবিদ, সংসদ সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের সঙ্গে পরামর্শ করে বাজেট প্রস্তাব করলে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে অনেকে মনে করেন।

বরাবরের মতো এবারও বাজেট নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছে। অনেকেই একে বাস্তবতাবিবর্জিত ও উচ্চাভিলাষী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচনার দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে— বাজেটে কিছু পণ্যে শুল্ক কর ও ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হলেও তার তালিকা অনেক ছোট। বাজেটে পাচারের টাকা ফেরত আনা ও খেলাপিঋণ উদ্ধারে বিশেষ ব্যবস্থাপনা নেই। বাজেটে দুর্নীতি ও বৈষম্য মুক্তির নির্দেশনা নেই, বরং জনগণের কাঁধে নানাভাবে করের বোঝা চাপানো হয়েছে। টিআইএন বা কর শনাক্তকরণ নম্বরধারীদের আয় করমুক্ত আয়সীমার নিচে থাকলেও তাদেরকে ন্যূনতম ২০০০ টাকা কর দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আবার সেই কর উঠাতে ৪৪ ধরনের সেবায় আয়কর প্রাপ্তিস্বীকারপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য দেশের মতো সবকিছু অনলাইনভিত্তিক করে ফেলতে পারলে বিষয়টির সহজ সমাধান হতো। মুদ্রাস্ফীতি কমানোর কোনো দিকনির্দেশনা বাজেটে নেই। বাজেটে বড় ব্যয়ের পরিকল্পনা থাকলেও কীভাবে আয় বাড়ানো যাবে, তারও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা পেশ করা হয়নি। বাজেটে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির তেমন কোনো দিকনির্দেশনাও চোখে পড়ে না। অথচ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারের ভারে আমাদের অর্থনীতি ন্যুব্জ। ওদিকে বিদেশী চাকরিজীবীরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ২৭ শতাংশে উন্নীত করার যে ঘোষণা এসেছে, তাও বাস্তবসম্মত নয় বলে অনেক অর্থনীতিবিদের বিশ্বাস। মানবসম্পদ তৈরির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বাড়ানো জরুরী। দক্ষ ও ন্যায়-নীতিবান জনসম্পদ ছাড়া দেশের উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু এবার এ দু’টি খাত কিছুটা অবহেলিত রয়েছে গেছে। অথচ অর্থনৈতিক সংকটের এ বছরে সরকারের পরিচালনা ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ৭ শতাংশ। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটকে গরীববান্ধব দাবী করা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কমের দিকে থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম বাড়ানো উক্ত দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক। এতে স্বল্প আয়ের মানুষের উপরই চাপ বেশি পড়বে। মোটা অংকের বাজেট ঘাটতি থাকায় একদিকে যেমন রিজার্ভের উপর চাপ বাড়বে, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়বে।

পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত বাজেটে বেশ কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে ব্যক্তি-করসীমা বাড়ানো, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়ানো, কিছু বিলাসী পণ্যের আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা, সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু ইত্যাদি।

বর্তমান দেশের অর্থনীতির নাজুক পরিস্থিতি, রিজার্ভ ঘাটতি, ডলার সংকট, রেমিট্যান্স হ্রাস, কর্মসংস্থানের অভাব, আমদানি-রফতানির চ্যালেঞ্জ, করোনা-উত্তর অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ প্রদত্ত ঋণের শর্ত পূরণ, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি, সিন্ডিকেটের প্রাধান্য ইত্যাদি কারণে এবারের বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলো বাজেটে গুরুত্ব পাওয়া জনগণের নিকট খুব কাঙ্ক্ষিত ছিল।

মহান আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিসহ সার্বিক সমৃদ্ধি দান করুন। আমীন!

পরকালকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের সুফল

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ.

সরল অনুবাদ : আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে আখেরাতের চিন্তা করবে, আল্লাহ তার অন্তরে অভাবমুক্তি স্থাপন করবেন, তার এলোমেলো কাজগুলো সুবিন্যস্ত করবেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পৃথিবী তার নিকট এসে ধরা দিবে। আর যার চিন্তার বিষয় দুনিয়া হবে, আল্লাহ দরিদ্রতাকে তার কপালে লিখে দেবেন, তার সাজানো কাজগুলো বিক্ষিপ্ত করে দিবেন এবং দুনিয়ায় তার জন্য যা নির্ধারিত তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই সে পাবে না’।[১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকাল তাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য আর দুনিয়া তাদের পাথেয় সংগ্রহের স্থান। ফলে এই পৃথিবীতে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা, তার একমাত্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হলো পরকালে সাফল্য লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। কোনো অবস্থাতেই দুনিয়ার চাকচিক্য বা ভালোবাসা যেন তার হৃদয়কে আসক্ত না করে। তাই প্রত্যেকের একমাত্র কাজ হবে পাথেয় সংগ্রহের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া।

একজন মুমিনের জীবন ও কর্মের প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই পরকাল। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সে পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণ বর্জন করবে। কেননা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রিযিক্ব অন্বেষণ, ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পাদন, পারিবারিক প্রয়োজন মিটানো, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি করা সম্ভব নয়। পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু পরকালীন বিষয়ে আসক্ত হওয়া বৈরাগ্যবাদ ছাড়া কিছুই নয়, যা ইসলাম সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ ‘আর বৈরাগ্য, তারা নিজেরা আবিষ্কার করেছে, আমরা তা তাদের উপর আবশ্যক করিনি’ *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৭)*। তবে জীবনের অধিকাংশ সময় অবশ্যই পরকালের রাস্তায় কাটাতে হবে। একজন মুমিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। জীবনের প্রতিটি কাজের পিছনে তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে পরকালীন সাফল্য। প্রতিটি কাজ সে সৎ নিয়্যতে করে, যাতে উত্তম প্রতিদান পায়। এজন্য আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন, ‘হে আল্লাহ! দুনিয়ার চিন্তাই আমাদের চিন্তার একমাত্র মাধ্যম বানিয়ো না, এটিকেই আমাদের জানার বা আলোচনার একমাত্র উৎস বানিয়ো না এবং এমন ব্যক্তিকে আমাদের উপর আধিপত্য দিয়ো না, যে আমাদের উপর দয়া করবে না’।[২]

হে আল্লাহর বান্দা! যে পরকালকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বানায় তার সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো, সে আল্লাহর নিকট থেকে এমন জীবিকা পায়, যা তাকে পরিতৃপ্ত করে, যা তার জীবন সুন্দর করে, যা সাধারণ জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট যদিও সেটা পরিমাণে কম হয়। কেননা আল্লাহ তাকে এমন পরিতৃপ্তি ও পূর্ণতা দান করেন, যা তার চাহিদাকে মিটিয়ে দেয়। এজন্যই তো আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ‘ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তাকে পরিমিত পরিমাণ রিযিক্ব দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যে রিযিক্ব দিয়েছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট’।[৩]

পার্থিব জীবনের সাধারণ অবস্থা কিংবা অতিসাধারণ জীবন যাপন মোটেও লজ্জাজনক কিংবা তাচ্ছিল্যের নয়। কেননা অমুখাপেক্ষিতা, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব এমন বিশেষত্ব লাভ করে, যা তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। পার্থিব জীবনের সুখ কিংবা সমৃদ্ধি কোনোভাবেই তার নিকট মূল্যবান নয়। কেননা সে জানে, দুনিয়ার প্রতি আসক্তিই মানুষের লাঞ্ছনার কারণ। হাসান বাছরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি এমন সব লোককে দেখেছি, যারা দুনিয়ার প্রাপ্তিতে মোটেও আনন্দিত হয় না। কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে বা কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তারা মোটেও আফসোস করে না বা হতাশ হয় না। তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সবকিছু মাটির চেয়েও তুচ্ছ।[৪]

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. তিরমিযী, হা/২৪৬৫, হাদীছ ছহীহ।
২. তিরমিযী, হা/৩৫০২, হাসান।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫৪।
৪. আহমাদ, ‘আয-যুহদ’ অধ্যায়, পৃ. ২৩০।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সত্য কথা হলো, সম্পদের আধিক্যই ধনাঢ্যতা নয়, যদিও মানুষের নিকট তা ধনাঢ্যতা; বরং আত্মার অভাবমুক্তি ও হৃদয়ের অমুখাপেক্ষিতাই হলো প্রকৃত অভাবমুক্তি ও ধনাঢ্যতা। যেমন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সম্পদের আধিক্যই অভাবমুক্তি নয়; বরং আত্মার অভাবমুক্তিই প্রকৃত অভাবমুক্তি’।[৫]

এভাবে মানুষ উত্তম জীবন লাভে ধন্য হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘যে ব্যক্তি সৎ আমল করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী এমতাবস্থায় যে সে একজন প্রকৃত মুমিন; আমি (আল্লাহ) অবশ্যই (দুনিয়ায়) তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং (পরকালে) অবশ্যই তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দিব’ *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*।[৬] আলী ও ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা বলেন, এখানে উত্তম জীবন বলতে পরিতৃপ্ত জীবনকে বুঝানো হয়েছে।[৭]

পরকালের চিন্তায় বিভোর হওয়া চিরন্তন আবাস, পরম সুখ ও আল্লাহ তাআলার স্থায়ী নেয়ামত লাভের মাধ্যম। এতে জীবিকা এমন প্রশস্ত হয় যে, সে কোনো ধরনের অভাব-অনটন বোধ করে না। আর নশ্বর দুনিয়ার চাকচিক্যে আসক্তি ও ব্যস্ততা তাঁর মধ্যে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে, তাকে সর্বদা অস্থির রাখে এবং তার রিযিক্বকে সঙ্কুচিত করে দেয়। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, ‘যে শুধু পরকালের কথা ভাবে’ অর্থাৎ যার সকল চিন্তা-ভাবনা একমাত্র পরকালের উদ্দেশ্যে হয়, আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজ সহজ করে দেন। তার জীবনে সচ্ছলতা ও প্রশস্ততা এনে দেন। তার হৃদয়কে অভাবমুক্ত করে দেন। তাকে ততটুকু রিযিক্ব দেন, যা তার জন্য যথেষ্ট হয় এবং তাঁর যা আছে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। সে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। ফলে সে অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায় না। তার জীবনের সকল এলোমেলো কাজ বিন্যস্ত হয়ে যায়। সে এমন সাজানো ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে, যেখানে পূর্ণ স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। তার আত্মা এমন স্বচ্ছতা ও নির্মলতা লাভ করে, যা তাকে অফুরন্ত মানসিক শান্তি লাভ করতে সাহায্য করে। ফলে আত্মার উৎফুল্লতা ও আনন্দঘন পরিবেশে তার জীবন হয়ে উঠে আনন্দময়। পরিবার, সন্তান, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষ সবাই তাকে সম্মান করে। তারা তাকে অভ্যর্থনা জানানোর অপেক্ষায় থাকে। কেননা যার সকল নিয়্যত একমাত্র পরকালের উদ্দেশ্যে হয়, সে আল্লাহর অফুরন্ত ভালোবাসায় সিক্ত হয়। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তার প্রতি আকাশবাসীর হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ফলে পৃথিবীবাসী তাকে গ্রহণ করার জন্য অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। অতএব, তুমি তাকে ভালোবাসো’। অতঃপর জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসেন এবং আকাশবাসীকে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। অতএব, তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালোবাসে এবং তারপর পৃথিবীতে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮]

পরকালে আসক্ত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া এই কারণে যে, তিনি দুনিয়ার বিষয়, বিভিন্ন সমস্যা ও ব্যাপক ব্যস্ততা ইত্যাদিতে তার জীবনকে বিক্ষিপ্ত করেন না। ফলে আল্লাহ তার সবকিছু সহজ করে দেন, সব ধরনের সংকীর্ণতা ও আশঙ্কা থেকে মুক্তিদান করেন। কেননা যার সকল চিন্তা একমাত্র আখেরাত ভিত্তিক হয়, সে মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক্ব দেন, যা সে ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন আর তিনি সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন’ *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*। এর পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন’ *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*। অতঃপর দুনিয়ার সবকিছু তার করায়ত্তে চলে আসে অথচ সে দুনিয়াসক্ত নয়। পৃথিবীর সবকিছু তার কাছে অনুগত হয়ে ধরা দেয়।

এর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান যে, কেউ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হোক অথবা পরকালের প্রতি আসক্ত হোক, সে দুনিয়ার ততটুকুই পাবে যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা আছে; কিন্তু পরকাল

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৪৬।
৬. তাফসীর ইবনু কাছীর (দারুল মুফীদ, বৈরূত, লেবানন), ৩/৩৭৩।
৭. তাফসীর ইবনু কাছীর (দারুল মুফীদ, বৈরূত, লেবানন), ৪/৫৩৮।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৩৭।

যার একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়া তার নিকট বশীভূত হয়ে উপস্থিত হবে। কেননা সে দুনিয়ায় নিজেকে জড়ায়নি বা সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়নি; বরং সে দুনিয়ায় যা পেয়েছে তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং যা হালাল তা ব্যবহার করেছে। আর যা সে হারিয়েছে বা যা তার ক্ষতি হয়েছে তাতে সে হতাশ হয়নি। কারণে সে জানে এটি তার জন্য নয়। এই কারণে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং চাওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা অবলম্বন করো। কেননা কোনো মানুষই তার (নির্ধারিত) রিযিক্ব সম্পূর্ণ ভোগ না করে মরবে না; যদিও দেরিতে হয়। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো আর সুন্দরভাবে চাও। যা হালাল তা গ্রহণ করো আর যা হারাম তা বর্জন করো'।[৯]

অর্থাৎ নম্রভাবে রিযিক্ব চাও তথা হালাল উপায়ে রিযিক্ব উপার্জন করো আর হারাম উপায়ে রিযিক্ব অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ 'তোমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে পরকালের বাসস্থান অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়ায় তোমার অংশ পেতে ভুলো না' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৭)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার অধিকাংশ তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য লাভের খাতে ব্যয় করো; যার মাধ্যমে তুমি দুনিয়া ও পরকালে প্রতিদান লাভ করবে। আর খাবার, পানীয়, পোশাক, আবাসন ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন তা ভোগ করো; কেননা তোমার উপর তোমার শরীর ও পরিবারের অধিকার আছে। প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার দিয়ে দাও।[১০]

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, 'দুনিয়ায় তোমার অংশ পেতে ভুলো না'-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, দুনিয়ায় পরকালের উদ্দেশ্যে আমল করতে ভুলো না। আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, একদল মানুষ আয়াতটিকে এমন অর্থে ব্যবহার করছেন, যেটি তার উদ্দিষ্ট অর্থ নয়। কেননা 'দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলো না'-এর অর্থ দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে আমল করতে ভুল করো না। আয়াতটি আমাদেরকে দুনিয়ার উপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। বিশেষভাবে যখন দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা করা হয়, তখন অবশ্যই পরকালকে প্রাধান্য দিতে হবে। হে বন্ধু! তুমি যদি সকল চিন্তাকে পরকালভিত্তিক করো; তবে আল্লাহ তাআলা তোমার দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কেননা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তাকে একমাত্র পরকালের উদ্দেশ্যে করবে, তার দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'।[১১]

'যার চিন্তা একমাত্র দুনিয়াকে ঘিরে হয়' অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য এবং ব্যস্ততা শুধু পার্থিব জীবনের জন্য হয়। এক্ষেত্রে যদি সে শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার কপালে দারিদ্র্য লিখে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ তার অভাব ও চাহিদাকে তার চোখের সামনে এমনভাবে এনে দেন যে, ধনী হওয়া সত্ত্বেও সে অভাব ছাড়া কিছুই দেখে না। আল্লাহ তাআলা তার জীবনকে বিক্ষিপ্ত করে দেন। ফলে তার সাজানো জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। তার জীবন সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অথচ পৃথিবীতে তার প্রাপ্তি তাই থাকে, যা তার জন্য নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছুই সে অর্জন করতে পারে না।

পরকালকে ইহকালীন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করার সাফল্য, সার্থকতা ও ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ঝামেলামুক্ত, সাচ্ছন্দ্যময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন প্রত্যেকে লাভ করতে চায়। কিন্তু এই নশ্বর পৃথিবীর প্রভাব, সাময়িক ক্ষমতা, অস্থায়ী চাকচিক্য ও কৃত্রিম সৌন্দর্য আমাদেরকে মোহাচ্ছান্ন করে ফেলে। ফলে আমরা বিক্ষিপ্ততা, দুশ্চিন্তা, বিপদ-আপদ, সমস্যা, প্রতিকূলতা, সংকীর্ণতা ও অভাব-অনটনের সম্মুখীন হই। দুনিয়ায় উত্তম জীবন লাভ ও পরকালে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য হাদীছের শিক্ষাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। হাদীছের আলোকে আমরা যদি এ জীবনকে গড়তে পারি, তবে আমাদের জীবন এমন শান্তিপূর্ণ, এমন অভাবমুক্ত ও সচ্ছল হবে, যেখানে আমরা কখনও অভাব-অনটন, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা অনুভব করব না। আমাদের জীবন এমন অনুপম, নির্মল, স্বচ্ছ হবে, যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি বিরাজ করবে। আল্লাহ আমাদের শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও সুন্দর জীবন লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৯. ইবনু মাজাহ, হা/২১৪৪, হাদীছ ছহীহ।

১০. তাফসীর ইবনু কাছীর (দারুল মুফীদ, বৈরূত, লেবানন), ৩/৩৭৩।

১১. ইবনু মাজাহ, হা/৪১০৬, হাসান।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-১৪)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : কিছু সংশয় ও তার জবাব

দলবাজদের কোনো কোনো দাঈ নিজেদের দলাদলিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কুরআন-হাদীছ ও আলেম-উলামার কিছু বক্তব্যকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে; অথচ সেগুলো তাদের বিরুদ্ধেই যায়। 'অশিক্ষিত মানুষ এগুলোর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে হোঁচট খাওয়ার ঝুঁকি না থাকলে এগুলো আসলে উল্লেখ করারই যোগ্য না'।[১]

তারা যেগুলোকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

এক. আমীরুল মুমিনীন তথা মুসলিমদের একক শাসক ও (রাষ্ট্রীয়) সরকার সংশ্লিষ্ট বক্তব্যগুলোকে তারা দাওয়াতী জামা'আত ও (ধর্মীয়) দলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে; অথচ তারা এই দলীল গ্রহণ ও অপপ্রয়োগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে। এমনকি তারা স্বীকারও করে যে[২], এই বক্তব্যগুলো সবই 'সরকার ও রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট'।[৩]

এরপরও তারা দলীল হিসেবে পেশ করে!!

কিন্তু কেন?!

আমরা নবম পরিচ্ছেদে (জামা'আত পরিভাষাটির ব্যাখ্যা) দলীল গ্রহণের এই পদ্ধতি বাতিল প্রমাণ করেছি। আমরা স্পষ্ট বলেছি যে, এই পদ্ধতি দলীল গ্রহণের ইলমী পদ্ধতির মূলনীতিবিরোধী এবং উম্মতের বিভক্তির কারণ।

দুই. জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করতে হয়— এমন কতকগুলো ফরয কাজকে তারা দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমের উপর ক্বিয়াস করে থাকে!! অথচ এটা ইবাদতে ক্বিয়াস, যা বাতিল বলে গণ্য। আসলে এসবগুলোই হচ্ছে নিছক ইবাদত (اَلتَّعَبُّدُ الْمَحْضُ)। তা না হলে 'আমাদের দ্বীন জামা'আতবদ্ধ'[৪]-এই যুক্তি দেখিয়ে আমরা সুন্নাতে রতেবাহ ও অন্যান্য নফল ছলাতকেও জামা'আতের সাথে আদায় করতে বলতে পারি কি?!

উত্তরে যদি বলা হয়, না, তা করা যাবে না। কেননা শরী'আতে এমনটা আসেনি। তাহলে বলবো, হ্যাঁ, এটাও তো শরী'আতে আসেনি। আর এদু'টোর মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (মাধ্যম ও লক্ষ্যের ঠেলাঠেলির মাঝে দ্বীনী কার্যক্রম) এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হয়ে গেছে, যা এখানে পুনর্বার উল্লেখ করার কোনো দরকার নেই।

তিন. মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 'তোমাদের মধ্য থেকে যেন এমন একটা দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান, ৩/১০৪)*।

তারা বলে, এখানে উম্মতের কতককে দাওয়াতদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর এই 'কতক' কথাটি জামা'আত[৫] ছাড়া আর কিছু হতে পারে না! অতএব, 'এটা শারঈভাবে ফরয এবং মানবিকভাবেও আবশ্যক'!! আর সূত্রে বলা আছে, 'যা ছাড়া ওয়াজিব সম্পন্ন হয় না, তাও ওয়াজিব'[৬] [مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]!!

এর জবাবে বলা যায়—

(ক) 'উম্মাহ' (أُمَّةٌ) শব্দের অর্থকে উক্ত অর্থে সীমাবদ্ধ করা একগুঁয়েমি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ 'ভাষাবিদগণ শব্দটির ১৫টি অর্থ উল্লেখ করেছেন। আমি কাউকে কাউকে ৪০টি অর্থ পর্যন্ত বর্ণনা করতে দেখেছি। সেগুলোর মধ্যে

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ৩১৪।

২. যেমনটা স্বীকার করেছেন আব্দুল্লাহ উলওয়ান তার 'বায়নাল আমালিল ফারদি ওয়াল আমালিল জামাঈ' বইয়ের ৭৯ পৃষ্ঠায়।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. যেমনটা তারা সারাক্ষণ বুলি আওড়ায়। দেখুন: আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ: ফারীযাহ শার'ঈয়্যাহ, পৃ. ৩৭; আত-তানযীমুল হারাকী ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮; মাশরূ'ইয়্যাতুল আমাল আল-জামাঈ, পৃ. ১০-১১।

৫. মুহাম্মাদ আল-হাসান, আল-মাযাহিবু ওয়াল আফকারুল মু'আছিরাহ ফিত-তাছাওউর আল-ইসলামী, পৃ. ৬।

৬. আব্দুল্লাহ উলওয়ান, বায়নাল আমালিল ফারদি ওয়াল আমালিল জামাঈ, পৃ. ৮১।

একটি অর্থ হচ্ছে, জামা'আত। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তি, যিনি হক্বের দাওয়াত দেন'।[৭]

(খ) উক্ত আয়াতটির তাফসীরে উলামায়ে কেরামের দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায়:

১. مِنْكُمْ-এর مِنْ অব্যয়টি জাতি বা শ্রেণি (جِنْسٌ) বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ তোমরা সকলেই অনুরূপ হও। এখানে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। উপর্যুক্ত আয়াতটি ঠিক নিম্নবর্ণিত আয়াতটির মতো: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ 'আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা (পুলছিরাত) অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত' *(মারইয়াম, ১৯/৭১)*। এখানে কোনো মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এটি পুরো জাতির উদ্দেশ্যে সম্বোধন; প্রত্যেকেই তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী।

২. এখানে مِنْ অব্যয়টি 'কতক' অর্থে এসেছে। তখন আয়াতটির অর্থ হবে, যারা সৎকাজের আদেশ দিবেন, তাদের আলেম হওয়া ওয়াজিব। আর একথা জানা যে, প্রত্যেকটি মানুষ আলেম নন। এই অর্থটিকে ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে *(৪/১৬৫)* অগ্রাধিকার[৮] দিয়েছেন।

(গ) মহান আল্লাহ উপর্যুক্ত আয়াতটির পরেই এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন— ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ 'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব' *(আলে ইমরান, ৩/১০৫)*।

'এখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং বিভক্তির মাঝে বড় ধরনের সম্পর্কের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াত দু'টি যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত এক হয়ে ও একদেহ হয়ে কাজ না করতে পারবে, ততক্ষণ এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না।

তারা যখন বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেরা অক্ষম হয়ে যাবে। ফলে অন্যদের প্রতি তাদের করণীয় সম্পন্ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না'।[৯]

(ঘ) আলোচ্য আয়াতটির পূর্বের আয়াতটিও এ অর্থকেই জোর দেয় এবং স্পষ্ট করে। যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ 'আর তোমরা সকলে একসঙ্গে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

কারণ আয়াতটিতে উম্মতের ঐক্যের বিবরণ রয়েছে এবং রয়েছে জামা'আতবদ্ধভাবে থাকার আহ্বান। নিশ্চয় এখানে জাতিতে জাতিতে আর দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কোনো উপকরণ নেই। অতএব, বিষয়টি অনুধাবন করুন!

আল্লামা শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে নাছের আস-সা'দী বলেন, '...এই দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন আলেমগণ, সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে বক্তব্যদানে ও মানুষকে ওয়ায-নছীহতে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সে সমস্ত লোক, যারা মানুষকে ছলাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় ও দ্বীনের বিধিবিধান বাস্তবায়নে বাধ্য করে এবং অন্যায়-অপকর্ম থেকে বারণ করে।

অতএব, যারাই মানুষকে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে অথবা সাধারণ বা বিশেষ নছীহত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তারা সকলেই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে বিভক্তদের পথে চলতে নিষেধ করেছেন, যাদের নিকট দ্বীন ও স্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে, যা তাদেরকে তদনুযায়ী আমল করা ও ঐক্যবদ্ধ থাকা আবশ্যক করেছে। তারপরও তারা দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে'।[১০]

সারকথা হচ্ছে, আলেম, দাঈ, শিক্ষার্থীসহ সকল মুসলিমের আমলের মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। 'যেই হোক না কেন কোনো মুসলিমের জন্যই দাওয়াতী নীতিবিরোধী কোনো দাওয়াতী কার্যক্রম উদ্বোধন পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আল্লাহর দ্বীন ও শরী'আতে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংমিশ্রণ চলবে না; চলবে না কোনো ধরনের ছাড়'।[১১]

ইসলামী কার্যক্রম কোনো 'কোম্পানি' বা কোনো 'সংস্থা' নয় যে, মানুষ সেখানে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় থাকবে অথবা তার কর্মচারী হওয়ার ব্যাপারে অনুমোদনের প্রতীক্ষায় থাকবে!!

চার. 'যা ছাড়া ওয়াজিব সম্পন্ন হয় না, তাও ওয়াজিব' [مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]- এই সূত্র দ্বারা দলীল দেওয়ার চেষ্টা করা একটি বাতিল পদ্ধতি। কারণ সূত্রের দু'টি ওয়াজিবই

৭. কাযী ইবনুল আরাবী আল-মালেকী, আহকামুল কুরআন, ১/২৯২।

৮. শায়খ বাকর আবু যায়েদ 'হুকমুল ইনতিমা' বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'এখানে উম্মাহ বলতে আলেমশ্রেণি উদ্দেশ্য, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ উম্মতের সাধারণ জনগণকে সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। তারাই হচ্ছেন উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাদের নিকট গেলে মানুষের মন প্রশান্তি পায়। তারাই অহির আলোর মশাল জ্বালান এবং তারাই আল্লাহর দিকে ডাকেন'।

৯. হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ১৩২।

১০. তাইসীরুল কারীমির রহমান, ১/১৯৫।

১১. হুকমুল ইনতিমা, পৃ. ১৫৯।

শরী'আতসিদ্ধ হতে হবে অথবা শরী'আতের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক হওয়া চলবে না।

আর ইতোপূর্বে আমরা বিস্তারিত দেখেছি যে, দাওয়াতের মাধ্যম তার লক্ষ্যের মতোই; অবশ্যই তা শরী'আতসিদ্ধ, সুবিদিত ও দলীলসমর্থিত হতে হবে।

এই সূত্র দ্বারা দলীল গ্রহণের অসারতা আপনার কাছে নিম্নবর্ণিত কয়েকভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে:

(ক) কোনো ব্যক্তি মানত করলে তার উপর মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি সে মানত পূর্ণ করার মতো মাল না পায়, তাহলে তাতে কি তার কোনো অপরাধ হবে? অথবা সেই মানত পূর্ণ করার জন্য চুরি করা তো দূরে থাক কোনো ধরনের ফন্দি আঁটা কি তার উপর ওয়াজিব হবে?

এর শারঈ সমাধান হচ্ছে, সামর্থ্য থাকা অবস্থায়[১২] মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। সামর্থ্য না থাকলে ওয়াজিব নয়। ব্যাপারটা এখানে এরকমই।

শরী'আত পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যমতের আদেশ করেছে এবং দলাদলি ও বিভক্তি করতে নিষেধ করেছে। তাহলে যমীনে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের মতো বিরাট ওয়াজিব পালনে উম্মতের কর্তব্য কী?'[১৩] এই ওয়াজিব পালনে নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা কি তাদের উপর ওয়াজিব? নাকি শরী'আতসিদ্ধ বিষয়ের কাছাকাছি থাকা এবং নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করা ওয়াজিব?

(খ) যদি দলাদলি ও বিভিন্ন দল প্রতিষ্ঠা ওয়াজিব হতো, তাহলে 'অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর উপর তা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেওয়া ওয়াজিব হতো, যা অজুহাত পেশ করার পথ বন্ধ করে দিত'।[১৪] তা বিভিন্ন মতের লুটের মাল, বিভিন্ন দলের পক্ষপাতিত্বের লক্ষ্যবস্তু, মতানৈক্যের উৎস ও বিভক্তির ভান্ডার হিসেবে রেখে দেওয়া হতো না।

বরং মহান আল্লাহ তার কিতাবে এবং রাসূল ﷺ তার হাদীছে যে বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে— ইসলাম ও মুসলিমদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে; ডানে-বামে বিভক্ত হয়ে যাওয়া যাবে না।

(গ) উপর্যুক্ত কাঙ্ক্ষিত ওয়াজিব -তাদের ধারণা মতে- বিষয়ের উৎস কোথায়? বিবেক নাকি শরী'আত? প্রবৃত্তি নাকি কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি? অনৈক্য নাকি ঐক্য? বিভক্তি নাকি মিল? নাকি তারা মনে করে, লক্ষ্য মাধ্যমকে বৈধ করে দেয়?!

(ঘ) আলোচ্য সূত্রটির বাস্তবায়ন শুদ্ধ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে:

১. মূল ওয়াজিব বাস্তবায়নের বিষয়টি এই শাখাগত ওয়াজিবের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। এর বাইরে কোনো পথ নেই।

২. শাখাগত ওয়াজিবটি বিদ্যমান থাকলে মূল ওয়াজিব বিষয়টি বিদ্যমান থাকা অবধারিত হতে হবে; স্রেফ ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত হলে চলবে না।

এই দু'টি শর্তই এখানে অনুপস্থিত।

(ঙ) শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ-এর দিকে সম্বন্ধিত একটি বক্তব্যকে তারা উল্টো বুঝেছে এবং ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছে।[১৫]

শায়খুল ইসলাম তার 'মাজমূ'উল ফাতাওয়া' (১১/৯২)-তে ছূফীদের মতো কিছু দলের চালু করা কিছু শব্দ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন। ফলে সেই মন্তব্যগুলো 'পরিভাষায়' পরিণত হয়, যার রয়েছে বিশেষ অর্থ ও সঙ্কেত। তার মন্তব্যসমূহের মধ্যে একটি মন্তব্যে তিনি বলেন, وَأَمَّا " رَأْسُ الْحِزْبِ " فَإِنَّهُ رَأْسُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَتَحَزَّبُ أَيْ تَصِيرُ حِزْبًا فَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ التَّعَصُّبِ لِمَنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِزْبِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهَذَا مِنْ التَّفَرُّقِ الَّذِي ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمَرَا بِالْجَمَاعَةِ والائتلاف وَنَهَيَا عَنْ التَّفْرِقَةِ وَالِاخْتِلَافِ وَأَمَرَا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَنَهَيَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

'দলনেতা, যিনি এমন দলের নেতা, যে দলটি আসলেই একটি দলে পরিণত হয়েছে। তারা যদি কোনো রকম কম-বেশি করা ছাড়া আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর আদেশের উপর সমবেত হয়, তাহলে তারা মুমিন। ভালো করলে তাদের পক্ষে যাবে; মন্দ করলে তাদের বিপক্ষে যাবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর আদেশে কম-বেশি করে, তাহলে তা

---

১২. ইবনুল ক্বাইয়িম, এ'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৩/২৯।

১৩. যেমনিভাবে সর্বদা তাদেরকে বলতে শুনি এবং তাদের থেকে পড়ে থাকি।

১৪. শায়খ রবী' ইবনে হাদী, মানহাজুল আম্বিয়া ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ, পৃ. ১১৪।

১৫. আল-মুনতালিক, পৃ. ১৪৬! এই বইয়ের লেখকের কাছ থেকে তার মুক্বাল্লিদরা গ্রহণ করেছে। দেখুন: আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ বায়নাল ফারদিয়্যাতি ওয়াল জামা'ইয়্যাহ, পৃ. ৮১; মাহমূদ উবাইদাত, আছারুল জামা'আতিল ইসলামিয়্যাহ ফিল ক্বরনিল 'ইশরীন, পৃ. ১৬১; ছদিক আমীন, আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফারীযাহ শার'ইয়্যাহ ওয়া যরূরাহ বাশারিয়্যাহ, পৃ. ৪৪; নাদের নূরী, রসাইলুল ইখা, পৃ. ১৩।

হবে বিভেদ, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিন্দা করেছেন। যেমন— হক্ব বা বাতিল যে কোনো উপায়ে সে ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করা, যে তাদের দলে যোগ দিয়েছে। পক্ষান্তরে যে তাদের দলে যোগ দেয়নি, সে হকের উপর থাক বা বাতিলের উপর থাক, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। কারণ আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামা'আতবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ করেছেন এবং বিভক্তি ও বিভেদ করতে নিষেধ করেছেন। তারা পুণ্য ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে আদেশ করেছেন; কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন'।

এটাই শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্য। এতে আসলে কী আছে?

উপর্যুক্ত উক্তি দ্বারা দলাদলি বৈধ করার দলীল গ্রহণকারীকে নিম্নবর্ণিত কয়েকভাবে জবাব দেওয়া যায়:

১. শায়খুল ইসলামের গবেষণাটি হচ্ছে নামের ব্যাপারে; নামধারীর ব্যাপারে নয়। কারণ আলোচ্য বক্তব্যটির আগে ও পরে তিনি (الْفُتُوَّة), (الزَّعِيم) ও (الدَّسْكَرَة) নামগুলো উল্লেখ করেছেন।

সেজন্যই আলোচ্য বক্তব্যটির ঠিক আগের পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকটি নাম, যার সাথে মহান আল্লাহ কুরআন ও হাদীছে প্রশংসা ও নেকী জুড়ে দিয়েছেন, সেসব নামধারীরা প্রশংসিত। পক্ষান্তরে, কুরআন ও হাদীছে যেসব নামের সাথে তিনি নিন্দা ও শাস্তি জুড়ে দিয়েছেন, সেগুলোর নামধারীরা নিন্দিত। যেমন— মিথ্যা (الكذب), খিয়ানত (الخيانة), পাপাচার (الفجور), যুলম (الظلم), অশ্লীলতা (الفاحشة) ইত্যাদি'।

আর ইতোপূর্বে আমরা স্পষ্ট বলেছি যে, 'হিযব' (الحزب) বা দল শব্দটি কুরআনে কখনও প্রশংসা অর্থে এসেছে। আবার কখনও নিন্দা অর্থে এসেছে। দল যখন একটি হবে, তখন তা প্রশংসা অর্থে হবে আর যখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে, তখন তা নিন্দা অর্থে হবে। তাহলে ইবনু তাইমিয়্যাহ কর্তৃক 'হিযব' শব্দের ব্যাখ্যায় দলাদলিকে বৈধতা দেওয়া হলো কোথায়?

২. তিনি যে দলের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করছিলেন, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, 'তাদেরকে কোনো রকম কম-বেশি করা ছাড়াই আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের উপর সমবেত হতে হবে'। দলাদলি আসলে কি তদ্রুপ নাকি (উল্টো) কম-বেশির উপরই তা প্রতিষ্ঠিত?!

৩. বরং দলাদলি থেকে সতর্কতামূলক বহু বক্তব্য শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ থেকে এসেছে, যেগুলোর সামান্য কিছু ইতোপূর্বে গত হয়ে গেছে। আপনি তার নিম্নবর্ণিত বক্তব্যটি একটু অনুধাবন করুন: وَلَيْسَ لِلْمُعَلِّمِينَ أَنْ يحزبوا النَّاسَ وَيَفْعَلُوا مَا يُلْقِي بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَلْ يَكُونُونَ مِثْلَ الْإِخْوَةِ الْمُتَعَاوِنِينَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى **'...শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য মানুষের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি করে দেওয়া[১৬] সমীচীন নয়। তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে— এমন কিছু করা উচিত নয়। বরং তাদের নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগী ভাইয়ের মতো হওয়া উচিত'**।[১৭]

তার এ বক্তব্যটিও অনুধাবন করুন: '...কারো জন্য কোনো শায়খের দিকে এমনভাবে সম্বন্ধিত হওয়া উচিত নয় যে, তার অনুসরণ করতে গিয়ে মিত্রতা বা শত্রুতা গড়ে তুলবে। বরং প্রত্যেক ঈমানদার এবং তাক্বওয়াবান শায়খ ও ব্যক্তির সাথে মিত্রতা পোষণ করা তার উপর আবশ্যক। **সে কারো সাথে অতিরিক্ত মিত্রতা পোষণ করবে না**। তবে যদি কারো অতিরিক্ত ঈমান ও তাক্বওয়া দেখা যায়, তাহলে তার সাথে অতিরিক্ত মিত্রতা পোষণ করবে। সে সেই ব্যক্তিকে এগিয়ে রাখবে, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এগিয়ে রেখেছেন এবং তাকে প্রাধান্য দিবে, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রাধান্য দিয়েছেন'।[১৮]

এরকম বহু জায়গায় এই বিদগ্ধ ইমামের বহু বক্তব্য রয়েছে, যার পরিসংখ্যান জানা আপনার জন্য প্রায় অসম্ভব।

অতএব, আলোচ্য বক্তব্যটির বিকৃত অর্থ নিলে তা হবে স্পষ্ট যুলম এবং স্পষ্ট হকের ক্ষতিসাধন।

(চলবে)

---

১৬. বর্তমান যুগের দলবাজরা এই অকাট্য উক্তিটির ব্যাপারে কী করবে, যা অপব্যাখ্যার কোনো ধরনের সুযোগ নেই?!
এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, তা হচ্ছে— শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ-এর এই বক্তব্যটি শিক্ষকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে পেশকৃত, অথচ তারা জ্ঞানী এবং মানুষের পথনির্দেশক ও শিক্ষক। তাহলে অবস্থা কেমন হতো, যদি তিনি দলীয় দাঈ ও বিভিন্ন আন্দোলনধর্মী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে দেখতেন, যাদের মধ্যে জ্ঞান কমে গেছে, শিক্ষা বিলীন হয়ে গেছে, অথচ তারা যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের বিরোধিতায় মত্ত এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইমামগণের বক্তব্যের বিপরীতে অবস্থানরত?!
কোনো সন্দেহ নেই যে, এমন প্রেক্ষিতে তার বক্তব্য আরো শক্ত হতো এবং তার প্রত্যাখ্যান আরো কঠিন হতো। ইবনুল হাজ্জ প্রণীত 'আল-মাদখাল' *(৩/২১৬)* বইটি দেখুন; সেখানে এধরনের বক্তব্যের খণ্ডন বিধৃত হয়েছে।

১৭. মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২৮/১৫-১৬।

১৮. মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ১১/৫১২।

ইসলামে কথা বলার নীতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

কথা ভাব বিনিময়ের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কথা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। মানুষের জীবনে চলার জন্য, প্রয়োজনীয় কাজ সুচারুরূপে করার জন্য কথা এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জগতের সৃষ্টিশীল সবকিছুর নির্মাণ ও জীবনযাপনের সকল সৌন্দর্য কথার উপর নির্ভর করে। কথা বলার জন্য শব্দ প্রয়োগের তারতম্য ও এর যথাযথ ব্যবহার প্রত্যাশিত সফলতা নিশ্চিত করে। কখনো কখনো শব্দ প্রয়োগের অযত্নায়ন ব্যক্তির ব্যর্থতাকে অনিবার্য করে তোলে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, সুন্দর করে কথা বলা একটি আর্ট বা শিল্প। যে যত বেশি এ শিল্প রপ্ত করে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করেছে, সে তত বেশি উদ্দেশ্য সাধনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কথা বলার সময়ে শব্দ বা বাক্য এবং সুর ও ছন্দ একটু এদিক-সেদিক হলে, এর জন্য কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চড়া মূল্য দিতে হয়। প্রত্যাশিত লক্ষ্য আর ঘরে তোলা যায় না। সময়, পরিবেশ ও যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তার মনোজাগতিক অবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, এ্যাটিটিউড ও সাউন্ডের কম্বিনেশন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুন্দর ও ঠিকমতো কথার উপস্থাপনই লক্ষ্য হাছিলের সবচেয়ে কার্যকর উপাদান।

কারো কথার আঘাতে কষ্ট পেলে সে স্মৃতি মানুষ মনে রাখে, সে কখনো তা ভুলে না। বয়ে বেড়ায় আজীবন; সময়-সুযোগ পেলেই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তা বলে বেড়ায় বংশ পরম্পরায়। যুগের পর যুগ তা স্মৃতির অলিন্দে স্থায়ীভাবে স্থান করে নেয়। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় ও অভিমানে রোমন্থন করে সেই স্মৃতি। এজন্য আরবী প্রবাদ আছে, ‘জারাহাতুস সিনানে লাহাল ইলতিয়াম; ওয়ালা ইয়ালতামু মা জারাহাল্লিসান’ অর্থাৎ ‘কথার ঘা শুকায় না; মাইরের ঘা শুকায়’।[১] ব্যথা-বেদনা ও দুর্ভোগমাখা ফেলে আশা জীবনের কষ্টের কথা মানুষ বেমা'লূম ভুলে যায়; তেমন একটা মনে রাখে না। কিন্তু কথার ব্যথা এবং এর বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করতে থাকে অহর্নিশ, চলতে থাকে আজীবন।

আবার একটি কথা যদি মমতা মাখানো হয়, স্নেহের পরশে রঙিন হয়, সুন্দর-মায়াবী শব্দ প্রয়োগে ও দয়া-আন্তরিকতার চাদরে আবৃত শব্দ প্রয়োগে হয়, মানুষ কখনো তা ভুলে না; মনে রাখে আজীবন, তা দাগ কাটে মনে, জীবনের দেয়ালে স্থান করে নেয় সে কথা। যাপিত জীবনে কখনো কোনো দুর্ভোগে কোনো আর্থিক সহযোগিতার চেয়ে ভালো কথা দিয়ে, সুন্দর আইডিয়া দিয়ে কাউকে সঠিক পথে পরামর্শ দিলে অনেক সময় তা কালজয়ী হয়ে উঠে।

একটি ভালো কথা শুধু সুন্দর পরিবেশ তৈরিতে অনবদ্য ভূমিকাই রাখে না, বরং এর দ্বারা কার্যসিদ্ধ হয় সহজভাবে। এজন্যই ইসলামে কথা বলার আদব বা শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহ পাকের বাণী ইলাহী বিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ও মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছে। তার প্রথমটি হলো কথা বলার পূর্বে সম্ভাষণ করা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা মনোযোগ আকর্ষণে ও বক্তা-শ্রোতার মাঝে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য মহান আল্লাহ কথা বলার পূর্বে প্রথমে সালাম দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ‘যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দু‘আ। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও’ *(আন-নূর, ২৪/৬১)*। সালাম মানে অন্যের কল্যাণকামিতার ঘোষণা প্রদান করা। এই ঘোষণা বক্তা-শ্রোতার মাঝে আন্তরিক সহমর্মিভাব তৈরি করে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাদর সম্ভাষণ বা সালাম বিনিময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীছে অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের পাঁচটি হক্ব বা অধিকারের প্রথমটি হলো দেখা হলে সালাম দেওয়া।[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

১. শারহে কাফিয়া।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬২।

কথা শুরু করা বা বক্তব্য প্রদানে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে কথা বললে মানুষ বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত বিষয়ের থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ তাআলার নিয়োগপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তা রেকর্ডভুক্ত হয়ে দলীল হিসেবে সংরক্ষিত হয়।[৩] শব্দ প্রয়োগ ও সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের প্রতি খেয়াল করা বা কথা বলার আদব বর্ণনা সংক্রান্ত নির্দেশনা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন। এজন্যই সুন্দরভাবে ও উত্তমরূপে কথা বলতে, ভাব বিনিময়ে করতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ 'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে' *(আল-বাক্বারা, ২/৮৩)*।[৪]

ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী লোকদের সকলে ভালোবাসে ও পছন্দ করে। কথা বলার সময় ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অনেকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বা ইরিভিলেন্ট কথা, অনর্থক ও বাজে কথা মুখ ফসকে বলে ফেলি। তর্কের খাতিরে বা নিজের মতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অনেক কথায়ই বলা হয়। কথা বলার সময়ে হয়তো কথার ধারাবাহিকতায় মনে থাকে না বা সচেতন থাকি না। পরে মনে হয়, এ কথাটা না বললে ভালো ছিল। এজন্য ইসলামে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা পরিহার করতে বলা হয়েছে। সূরা আল-মুমিনূনে সফলকাম ব্যক্তিদের দীর্ঘ একটি তালিকা দয়াময় প্রভু উপস্থাপন করেছেন *(আল-মুমিনীন, ২৩/১-১১)*। তৃতীয় নম্বরটি হলো, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ 'যারা অপ্রয়োজনীয় কথা বা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে নিজেদের বিরত রাখে' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৩)*। ছহীহ বুখারীতে এই মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।[৫] কথা বলার সময়ে শব্দ প্রয়োগের পাশাপাশি কণ্ঠস্বরের উঠানামাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো কথা কর্কশভাবে বললেও শ্রোতা সহজভাবে সেটা নেয় না। প্রয়োজনীয় কাজে উদ্দেশ্য সফল হয় না। তাই কণ্ঠস্বরের ম্যাকানিজম কথা বলার প্রয়োজনকে সফলতার প্রান্ত সীমায় নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে এজন্যই কথা বলার সময়ে কণ্ঠস্বর নিচু করে কথা বলতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ 'পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লুক্বমান, ৩১/১৯)*। আরো বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্য শোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/২-৩)*।

অন্যদিকে বুদ্ধি খাটিয়ে বিচক্ষণতার সাথে কথা বলা হলো কার্যকর পদ্ধতি। তা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের পাশাপাশি অর্থবহ আইডিয়া শেয়ারিয়ং-কে নিশ্চিত করে। সূরা আন-নাহলে এই মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।[৬] কথা বলার সময়ে সঠিক কথা বলা শুধু ব্যক্তিত্ববোধ তৈরিতেই অনবদ্য ভূমিকা পালন করে না; বরং দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক সম্পর্কের মেলবন্ধনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক

---

৩. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বাফ, ৫০/১৮০)*।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১৩।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৫৯।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ 'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে' *(আন-নাহল, ১৬/১২৫)*।

কথা বলো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৭০)*। সঠিক কথা বলতেও আন্তরিকতার প্রলেপ এবং মোলায়েম ভাষা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কেননা কর্কশ ভাষায় সঠিক কথাও অনেক সময়ে শ্রোতা যার সাথে কথা বলা হচ্ছে তিনি ইতিবাচকভাবে নিতে চান না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ 'পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লুক্বমান, ৩১/১৯)*।

নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কথা বলার সময়ে কখনো ভালো-মন্দ মিশ্রণ করা ঠিক নয়। বরং কঠিন হলেও, পরিস্থিতি নিজের প্রতিকূলে গেলেও সত্যাশ্রয়ী এবং উত্তমের সাথে মিল হয়ে সর্বোত্তম কথা বলা উচিত। এতে দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ নিহিত থাকে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ 'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো' *(হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪১/৩৪)*।

কথা বলার সময়ে মনে রাখা দরকার যে বিষয়ের কথা হচ্ছে সে বিষয়ে কাজটা কেমন হবে। কথা ও কাজে মিল রাখা বা মিল থাকবে কিনা। প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালন করতে পারব কিনা; অথবা যা বলছি নিজে এর সাথে একমত কিনা; নিজে পালন করব কিনা? সাময়িক কিছু পাওয়া বা লাভের আশায় লুকানো চেতনাকে আড়াল করে কথা বললে পরবর্তিতে লজ্জিত হতে হয়। ইসলামে এই বিষয়কে সাংঘাতিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। বলা হয়েছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ 'তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না? এটা কতই না নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা যা করছ না তা বলছ' *(আছ-ছফ, ৬১/২)*। কথা বলার সময়ে সতর্কতা খুবই প্রয়োজন, সেটা যে লেভেলের লোকের সাথেই কথা বলা হোক না কেন। কথা যেমন জাদুর মতো কাজ করে, ঠিক কথাই কাল হয়ে যায়। কথা যেমন কাজের অনিবার্যতা তৈরি করে; কর্মপরিবেশ ঠিক করে; ঠিক কথার কারণে সবকিছু অনিশ্চিত হয়ে যায়; সাজানো-গোছানো অবস্থা নিমেষেই এলোমেলো হয়ে যায়। মুমিনের একটি কথা বা আইডিয়া প্রদান যেমন ছাদাক্বা ও বারাকাহ হয়, ঠিক কথাই পাপের বা হতাশার অনুরণন তৈরি করে। এজন্য বাক্যালাপে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কথা বলার সময়ে মূর্খ বা যারা যে বিষয়ের উপযুক্ত নয় তাদের সাথে ঐ বিষয়ে বাক্যালাপ না করে বরং এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ 'রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৬৩)*।

কথা আমানত, কথা হাতিয়ার, কথা একটি অনিবার্য রূপান্তর ও আসন্ন বিপ্লব। সুতরাং কথা বলতে হবে চিন্তা করে, হিসেব কষে, বুদ্ধিমত্তার সাথে। প্রযুক্তির এ গগণচুম্বী উৎকর্ষ সাধনের এই যুগে কথা বলতে হবে আরো যত্নায়নে। টেকনোলজি সব সংরক্ষণ করে রাখে। সময়ে অসময়ে ঘোর বিপদের কারণ হতে পারে আপনার মুখনিঃসৃত একটি দু'টি কথাই। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সঠিকভাবে আমল বা ইসলাম চর্চা করার তওফীক্ব দান করুন- আমীন!

আত্ব তাক্বওয়া স্টোর
নির্ভেজাল পন্যের প্রচেষ্টায়, ইন শা আল্লাহ

AT TAQWA STORE

আমাদের পেইজে থাকা পণ্যসমূহ ও মুল্য তালিকা :

- লিচু ফুলের মধু - ৫৫০ টাকা/কেজি
- কালিজিরা মধু - ৯৬০ টাকা/কেজি
- খাঁটি গাওয়া ঘি - ১৩০০ টাকা/কেজি
- মেশিনে ভাঙানো সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- ঘানি ভাঙ্গা সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- কালোজিরার তেল - ১০০ মিলি - ১৮০ টাকা
- খেজুরের গুড় - ২৭০ টাকা/কেজি

১৫০০ টাকার অর্ডার করলে কুরিয়ার চার্জ ফ্রি

অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫৭৫ ২৪৫ ৮৭২

সূচিপত্র

অহীর বাস্তবতা বিশ্লেষণ (২০তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২৭তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا القَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا القَوْلَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ، هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

অমুসলিমকে সালাম প্রদান করা :

এই হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাদশাহ হিরাক্লিয়াসকে সালাম প্রদান করেছেন, যদিও স্বাভাবিক সালামের চেয়ে ভিন্ন শব্দে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, অমুসলিমদেরকে এই নির্দিষ্ট ভাষায় সালাম প্রদানের প্রয়োগ কেমন হবে?

অমুসলিমকে সালাম প্রদানের বিষয়টি আমরা কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—

(১) যদি তারা সর্বপ্রথম সালাম প্রদান করে : যেহেতু সালাম একটি আসমানী অভিবাদন, সেহেতু সকল আসমানী ধর্মে সালামের প্রচলন আছে। এমনকি আজকের যুগেও ইয়াহূদী সমাজে সালামের প্রচলন আছে, যদিও তাদের সালামের উচ্চারণ একটু ভিন্ন। তারা উচ্চারণ করে থাকে 'শাবাত শালোম'। সুতরাং যদি কোনো অমুসলিম নিজে থেকেই সালাম প্রদান করে, তাহলে আমাদের উত্তর হবে 'ওয়ালাইকুম!' কেননা অনেক সময় উচ্চারণের পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা আমাদের মৃত্যু কামনা করতে পারে। যেমনটা তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে করেছিল।

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইয়াহূদীদের একটি দল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আগমন করে।

---

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

www.al-itisam.com

তারা রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে এই বলে অভিবাদন জানায় যে, 'আস-সামু আলাইকুম'। আমি তাদের এই কথা বুঝে ফেলি এবং তাদেরকে বলি তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমাদের মৃত্যু হোক! তখন রাসূল ﷺ বললেন, থাক, আয়েশা! নিশ্চয় মহান আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে কোমলতা ও ভদ্রতা পছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'আমি তো এজন্যই তাদের উত্তরে শুধু 'ওয়ালাইকুম' বলেছি। তথা তোমাদের উপরে অনুরূপ হোক যেমনটা তোমরা আমার জন্য বলেছ'।[১]

জ্ঞাতব্য : 'আস-সাম' শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। 'আস-সামু আলাইকুম' বলা অর্থ হচ্ছে মৃত্যু কামনা করা।

(২) যদি কোথাও মুসলিম এবং অমুসলিম একত্রিত থাকে : সেক্ষেত্রে আমরা পরিপূর্ণ সালাম নিজে থেকেই তাদেরকে প্রদান করতে পারি, তবে নিয়্যত থাকতে হবে শুধু মুসলিমদের জন্য।

(৩) যদি কোথাও কোনো মুসলিম না থাকে : তথা আমরা এমন কারো সাথে সাক্ষাৎ করছি, যেখানে অন্য কোনো মুসলিম নেই এবং সেই অমুসলিম ব্যক্তি নিজে থেকে আমাদেরকে সালামও দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমরা তার সাথে কীভাবে অভিবাদন করব? সেক্ষেত্রে দু'আ নয় এমন যেকোনো অভিবাদন-বাচক বাক্য দিয়ে তাদেরকে অভিবাদন প্রদান করা যাবে। যেমন— হাই, ওয়েলকাম।

ছহীহ মুসলিমের এক হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ 'তোমরা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সাক্ষাৎ হলে আগ বাড়িয়ে সালাম দিয়ো না এবং আগ বাড়িয়ে তাদের সম্মানে রাস্তা ছেড়ে দিয়ো না'।[২]

(৪) আমরা যদি বিশেষ কোনো দ্বীনী কাজে বিশেষ কোনো কাফের ব্যক্তির নিকট যাই, তখন 'আস-সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' এই বাক্য বলার মাধ্যমে তাকে অভিবাদন জানাতে পারি : রাসূল ﷺ-এর পূর্বেও অন্য নবীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও হারূন (আলাইহিস সালাম)-এর ফেরাউনের দরবারে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ 'অতঃপর তারা দুইজন ফেরাউনের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। তুমি বানূ ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে ছেড়ে দাও আর তাদেরকে আর কোনো শাস্তি দিয়ো না! আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি আর শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর, যারা হেদায়াতের উপর রয়েছে' *(ত্ব-হা, ২০/৪৭)*।

'আম্মা বা'দ'-এর বিশ্লেষণ?

রাসূল ﷺ-এর লিখিত উক্ত চিঠিতে তিনি প্রাথমিক ভূমিকার পর মূল কথায় যাওয়ার জন্য 'আম্মা বা'দ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা অদ্যাবধি আরবী ভাষায় বক্তব্যের ভূমিকা অবতারণার পর মূল কথায় যাওয়ার পূর্বে বলা হয়।

'আম্মা' মূলত একটি শর্তবাচক হরফ। আর 'বা'দু' হচ্ছে সময় নির্দেশক 'যরফ', যা পেশের উপর মাবনী। উভয়টি মিলে অর্থ দাঁড়ায়, مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ 'তথা এই কথার পরে যা কিছু'।

বক্তব্য বা লেখনীর মধ্যে হামদ ও ছানার পরে 'আম্মা বা'দ' ব্যবহার করা সুন্নাত। রাসূল ﷺ সবসময় তা করতেন। তবে সর্বপ্রথম কে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, সর্বপ্রথম দাঊদ (আলাইহিস সালাম) আর কেউ বলেছেন, সর্বপ্রথম ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৩]

দ্বীনে আসার পর কেউ কি মুরতাদ হয় না?

হাদীছের বাক্যে হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, এই দ্বীনে আসার পর কেউ দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যায় না। অথচ আমরা বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র দেখেছি। অনেক ছাহাবীও ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ। এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হাদীছে 'সাখতাতান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে এই দ্বীনের উপর নারাজ হয়ে বা বিরক্ত হয়ে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে যায় না। তথা ইসলাম ধর্মে আসার পরে এবং ঈমানের স্বাদ পাওয়ার পরে দ্বীনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তা অসম্ভব। তবে অন্য কারণে দ্বীন থেকে ফিরে যেতে পারে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ মুরতাদ হয়েছিল একজন খ্রিষ্টান ধর্মীয় নারীর প্রেমে পড়ার ফলে। ঠিক কেউ অর্থের লোভে, কেউ পারিবারিক কারণে, কেউ নারীর কারণে, কেউ ক্ষমতার কারণে দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আজ পর্যন্ত কেউই দ্বীন পরিপূর্ণ বুঝার পর তার প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে দ্বীন থেকে ফিরে যায়নি। সুতরাং হাদীছের কথা শতভাগ সঠিক।

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০২৪।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৭।

৩. ফাতহুল বারী, ২/৪০৪-৪০৫।

হিরাক্লিয়াস কি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

হিরাক্লিয়াসের নিজের কথা থেকেই প্রমাণিত হয়, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন, যদি আমি বুঝতে পারতাম যে, আমি তার নিকট পৌঁছতে পারব, তাহলে তার নিকটে যাওয়ার জন্য সকল কষ্ট বরদাশত করতাম এবং তার পা ধুয়ে দিতাম। তার এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি জানেন যে, তিনি যেতে পারবেন না। কেননা তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলে তার ক্বওম তাকে হত্যা করে ফেলবে। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় ইবনুন নাতুরের বর্ণনায়। আর হিরাক্লিয়াসের এই ঘটনা প্রমাণ করে, শুধু জানলেই কাউকে মুমিন বা মুসলিম বলা যায় না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সত্য নবী, এটা তার চাচা আবূ তালেব আরো ভালোভাবে জানতেন। কিন্তু তাকে আমরা মুমিন বলতে পারি না। কেননা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেননি। ঈমান বা ইসলামের জন্য অন্তরের বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রকাশ্য ঘোষণা জরুরী। যেহেতু হাদীছে আলোচিত এই দু'টি ঘটনা ব্যতীত হিরাক্লিয়াসের ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে অন্য কোনো সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না, পাশাপাশি উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর আমলে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যত অভিযান পরিচালিত হয়, তার অনেকগুলোই হিরাক্লিয়াসের জীবদ্দশায় ছিল। তন্মধ্যে ইয়ারমুকের যুদ্ধ অন্যতম। সুতরাং এই কথাই সত্য যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

খ্রিষ্টানরা কেন খাতনা করত না?

হিরাক্লিয়াসের নক্ষত্রবিদ্যা অনুযায়ী তিনি জানতে পারেন যে, তার রাজত্ব খাতনাকারী জাতির কাছে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তিনি তার সভাসদগণকে জিজ্ঞেস করেন, কারা খাতনাকারী ক্বওম। তখন তারা উত্তরে বলে, ইয়াহূদী ব্যতীত আর কেউ খাতনা করে কিনা তা তারা জানে না। পরবর্তীতে তারা আরো নিশ্চিত হয় যে, মক্কার আরবরাও খাতনা করে। এখান থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যেহেতু ঈসা আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনও দ্বীনে ইবরাহীমের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি মূসা আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনকে সত্যায়ন ও পরিপূর্ণ করার জন্য এসেছিলেন, সেহেতু মূসা আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনে খাতনা থাকলে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনে খাতনা থাকলে ঈসা আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনে কেন থাকবে না? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে সকল নবীর দ্বীনের মধ্যে ফিতরাত হিসেবে যে স্বাভাবিক সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাতনা। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনেও খাতনা ছিল, এটাই স্বাভাবিক। আমরা পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী জানি যে, খ্রিষ্টান ধর্মে বিকৃতি সাধন হয়েছে। পোল কর্তৃক খ্রিষ্টান ধর্মের বিকৃত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই খাতনার বিষয়টি। এই বিষয়ে সকল খ্রিষ্টান ধর্ম বিষয়ক গবেষকগণ একমত যে, ৫০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুযালেমে আয়োজিত খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সমাবেশে পোলের মাধ্যমে বিভিন্ন বিধান শিথিল করা হয়, তন্মধ্যে অন্যতম ছিল খাতনা করার বিধান।[৮]

খ্রিষ্টানদের পাদ্রীদের স্তরভেদ :

'সুকূফ' বা 'আসক্বাফ' শব্দের অর্থে আমরা বলেছিলাম, নির্ধারিত পদকে বলা হয় আসক্বাফ। খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে তিনটি মাযহাব আছে যাদের অনুসারী সবচেয়ে বেশি এবং যারা নিজেদেরকে আদি দাবি করে তাদেরকে বলা হয় রোমান ক্যাথলিক। তাদের পাদ্রীদের মধ্যে স্তরভেদ আছে। পদ ও পদবি আছে। যেমন সর্বোচ্চ পদের নামে পোপ। তাকে নিষ্পাপ মনে করা হয়। তিনি যা বলবেন তা সকল খ্রিষ্টান মানতে বাধ্য। তার পরের পদের নাম বিশপ। যাকে আরবীতে 'আসক্বাফ বা সুকূফ' বলা হয়েছে। একজন বিশপ একটা জেলার প্রধান হয়। তার অধীনে আর্চ বিশপ ও কর্ডিনেল বিশপ থাকে। এভাবে সংগঠনের মতো একটি ধর্মের পুরো সিস্টেমকে ধর্মীয় গুরুদের স্তরভেদের মাধ্যমে সাজানো নজিরবিহীন। এই ধরনের সাংগঠনিক অবকাঠামোর কারণে এই ধর্মের মধ্যে পাদ্রী কর্তৃক যুলুম ও নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে ইউরোপের সমাজে পাদ্রীদের যুলম-নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে গেছে। ধর্ম তার নিজস্ব স্বকীয়তা ও সার্বজনীনতা হারিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান যুগে মুসলিমদের মধ্যেও একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট দেশের গ্রান্ড মুফতীর ফতওয়া এবং নির্দিষ্ট দেশের কিবার ওলামা বোর্ড-এর সদস্যগণকেই একমাত্র কিবার উপাধি দেওয়ার মাধ্যমে একমাত্র তাদেরকেই ফতওয়া প্রদানের যোগ্য মনে করা। তাদের নামের আগেই একমাত্র 'শায়খ' যুক্ত করার উপযুক্ত মনে করা। তারা ব্যতীত অন্যদেরকে তালেবুল ইলম এবং নামের আগে উস্তায যুক্ত করা— তথা কিবার, শায়খ, উস্তায এভাবে ক্যাটাগরি ও পদবি ভাগ করা এবং নির্দিষ্ট আলেমের তাযকিয়া ছাড়া কাউকে আলেম মনে না করা। এগুলো সবই দ্বীনে ইসলামে জ্ঞানের যে উন্মুক্ততা এবং সার্বজনীনতা আছে, সেটাকে সংকীর্ণ করা ছাড়া বৈ কিছুই নয়। ইসলামের ইতিহাসে অতীতে কখনোই আলেমগণের মধ্যে এই ধরনের

---

৮. Cross, F. L.; Livingstone, E. A., eds. (2005). 'Paul the Apostle'. The Oxford Dictionary of the Christian Church (3rd Revised ed). Oxford: Oxford University Press. p. 1243-1245.

ক্যাটাগরি করার নজির পাওয়া যায় না। সারা দুনিয়ার আলেমগণের একজনকে প্রধান বানানো হবে। একটা বোর্ড থাকবে, যারা তাদের প্রধান নির্বাচিত করবেন। তিনি যাকে যাকে কিবার বলবেন তারা কিবার হবে, আর যাদেরকে আলেম বলবেন তাদেরকে আলেম বলা হবে, আর যাদেরকে তালেবুল ইলম বলবেন তারা তালেবুল ইলম। এই পদ অনুযায়ী লক্বব বা উপাধিও পরিবর্তন হবে কেউ শায়খ, কেউ উস্তায, কেউ আল্লামা। এই ধরনের কোনো নজির আমাদের সালাফদের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আমাদের সালাফগণ বিশ্বাস করতেন যার যার জ্ঞান, আমল ও ইখলাছ অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাকে ক্ববূলিয়্যাত দান করেন। সেই ক্ববূলিয়্যাত অনুযায়ী তাদের কথাকে মানুষ গ্রহণ করবে। আমরা পদবি অনুযায়ী আলেমকে বিবেচনা করব না; আমরা বিবেচনা করব তিনি কতটুকু ভুল বললেন এবং কতটুকু সঠিক বললেন সেই অনুযায়ী। কোনো কথা ভুল মনে হলে আমরা দলীল দিয়ে তা রদ্দ করব। মানুষ সঠিকটা বুঝে নিবে। ইসলামে কখনোই জ্ঞানকে নির্দিষ্ট আলেম, নির্দিষ্ট মাযহাব, নির্দিষ্ট মাদরাসা, নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট দলের নামে কুক্ষিগত করার বা সিন্ডিকেট তৈরি করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। ইলমের রাজনীতিকরণ বা ইলমের গ্রুপিং ও স্তরবিন্যাসের নামে ইলমকে সংকীর্ণ করা হবে সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টানদের অনুসরণ। যা ইলমের স্বাধীনতা, সার্বজনীনতা ও বরকতকে নষ্ট করে দিবে।

এই দ্বীনের জ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সার্বজনীনতা। যার ফলে এই দ্বীন মানুষের জন্য উন্মুক্ত। সকলেই কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। হাদীছের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সকলেই নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী প্রচার করতে পারবে। হ্যাঁ, কারো আক্বীদা এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হলে সে বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে সেটা সরকার গ্রহণ করবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

হাদীছের সারমর্ম শিক্ষাসমূহ :

(১) অমুসলিমদের সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রেখে নরম ব্যবহারের সাথে দাওয়াত দেওয়া। তাহলে মুসলিমদের বিভিন্ন ফেরক্বার পরস্পরের মাঝে দাওয়াতের ভাষা কতটা মার্জিত হওয়া উচিত।

(২) অমুসলিমদেরকে চিঠি লিখলে শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা যায়।

(৩) অমুসলিমদেরকে প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ কারণে ও পরিবেশে সালাম দেওয়া যায়।

(৪) যেহেতু চিঠি একজন ব্যক্তি নিয়ে গেছে, সেহেতু একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদ যেমন গ্রহণযোগ্য, তেমনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীছও গ্রহণযোগ্য।

(৫) প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে সফর করা যায়।

(৬) বংশ মর্যাদাকে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করে না। নবীগণ চিরদিন উঁচু বংশে প্রেরিত হয়েছেন। যদি তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা থাকে, তাহলে বংশের কারণে মানুষ অতিরিক্ত সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

(৭) নবীগণ সবসময় যুদ্ধে বিজয়ী হবেন এমন নয়; পরাজয়ও থাকতে পারে। দুনিয়াবী জয়-পরাজয় কখনোই হক্ব-বাতিলের মানদণ্ড নয়।

(৮) নবীগণ সমাজের উঁচু বংশে প্রেরিত হলেও তাদের অনুসরণ সবসময় গরীব বা সাধারণ মানুষ বেশি করে থাকে। কেননা সাধারণ মানুষের কোনো স্বার্থ থাকে না। ফলত তারা দ্রুত হক্ব গ্রহণ করতে পারে। আর সমাজের উঁচু শ্রেণির অনেক স্বার্থ থাকে, ফলত তারা দ্রুত হক্ব গ্রহণ করতে পারে না। কেননা হক্বের কারণে স্বার্থহানি ঘটা স্বাভাবিক। যেমনটা সত্য জানার পরও হিরাক্লিয়াস সত্যকে গ্রহণ করতে পারেনি।

(৯) নবীগণ কখনোই ধোঁকা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না; তারা সবসময় সত্যবাদী ও আমানতদার হয়ে থাকেন। অনুরূপই হক্বপন্থিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনো প্রকার লুকোচুরি থাকে না। সমাজের মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করে থাকে তাদের সততা ও আমানতদারিতার কারণে।

(১০) হক্বের উপর থাকলে দুনিয়াবী বিজয় অর্জনও সম্ভব। যেমনটা হিরাক্লিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাদের পূর্বসূরিরা বায়তুল মাক্বদিস বিজয়ে সক্ষম হয়েছিল।

(১১) দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে শুধু ইবাদত নয়, বরং সামাজিকতাও একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে কী কী আদেশ প্রদান করেন, এই কথার উত্তরে এই হাদীছে বলা হয়েছে— তিনি মানুষকে তাওহীদ, ছালাত, সততা, আত্মীয়তার সম্পর্ক, হারাম ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত থাকার আদেশ প্রদান করেন। উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে তাওহীদ ও ছালাত ব্যতীত বাকী তিনটি আমাদের সামাজিকতার সাথে জড়িত। মানুষের পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-ব্যবহারের সাথে জড়িত। সুতরাং দ্বীনকে শুধু ইবাদতকেন্দ্রিক করে ফেলা এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচারকে গুরুত্ব না দেওয়া কখনোই দ্বীনদারদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। দ্বীনের প্রকৃত রূপ তখনই ফুটে উঠে যখন আমরা ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের সাথে আমাদের আচার-ব্যবহারকে সঠিক করব এবং মানুষের হক্ব বিষয়ে সচেতন থাকব।

(চলবে)

যুবসমাজের অধঃপতনের কারণ ও উত্তরণের উপায়

-মাহবূবুর রহমান মাদানী*

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ تَعْظِيْمًا لِّشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا مَزِيْدًا. أَمَّا بَعْدُ:

যৌবনের গুরুত্ব :

মানুষ দুনিয়াতে একটির পর একটি ধাপ পার করে তার জীবন অতিবাহিত করে। মানুষের স্তরগুলো বীর্য থেকে জমাট রক্ত, অতঃপর তা হতে গোশতপিণ্ড, তারপর শৈশব, তারপর যৌবন, তারপর বার্ধক্যের প্রারম্ভ এবং পরে সম্পূর্ণ বার্ধক্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে এনেছেন শিশুরূপে, অতঃপর তিনি তোমাদের বৃদ্ধি দান করেন, যাতে তোমরা তোমাদের পূর্ণশক্তির বয়সে পৌঁছতে পার, অতঃপর আরো বৃদ্ধি দেন যাতে তোমরা বৃদ্ধ হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো আগেই মৃত্যু ঘটান, যাতে তোমরা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাও আর যাতে তোমরা (আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল) অনুধাবন কর' *(আল-মুমিন, ৪০/৬৭)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ 'আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল (শিশুকাল) অবস্থায়, অতঃপর তিনি দুর্বলতার পর শক্তি (যৌবনকাল) দিয়েছেন, তারপর শক্তির পর পুনরায় দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য' *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*। একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো তার যৌবনকাল। এই সময়টাতে একজন যুবককে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে অসংখ্য অশুভ শক্তি। এই বয়সটা অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যে তার যৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই হলো সফল যুবক। যুবকরাই হলো যে কোনো জাতির চালিকাশক্তি ও প্রাণ। যুবকদের শক্তিকে ভিত্তি করেই যে কোনো আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও সফল হয়, যার নজির বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার পরিবর্তন।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যেসব ছাহাবী ঈমান আনেন এবং তাঁকে, তাঁর দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন যুবক শ্রেণির। এমনকি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাদের হাতেই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উছামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ১৮ বছর বয়সে সেনাপতি, আত্তাব ইবনু উসাইদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে মাত্র ২০ বছর বয়সে মক্কার গভর্নর এবং মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ৩০ বছর বয়সে ইয়ামানের গভর্নর নিয়োগ করেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ২৩ বছর বয়সে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাসেম রাহিমাহুল্লাহ-কে ১৭ বছর বয়সে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি পারসিকদের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হন। তারপর তাকে সিন্ধু প্রদেশের সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি সিন্ধু ও ভারত উপমহাদেশ জয় করেন।

যুবকের সংজ্ঞা :

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ 'অবশেষে সে যখন পূর্ণশক্তি লাভ করে এবং ৪০ বছরে পৌঁছে যায়' *(আল-আহক্বফ ৪৬/১৫)*। এখানে (أَشُدَّهُ) আশুদ্দা বা পূর্ণশক্তি বলতে যৌবন কালকে বুঝানো হয়েছে। এই কথাটি কুরআনুল কারীমের ছয়টি স্থানে এসেছে *(আল-আনআম, ৬/১৫২; ইউসুফ, ১২/২২; আল-ইসরা, ১৭/৩৪; আল-কাহফ, ১৮/৮২; আল-ক্বাছাছ, ২৮/১৪)*। পরিপূর্ণ প্রাপ্ত বয়স হলো ১৫ বছর। এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয় সমান। তবে এর আগে যদি ছেলের স্বপ্নদোষ হয় আর মেয়ের হায়েয হয় তখন সেটাই সাবালক বয়স।[১] এর আরও প্রমাণ হলো, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য নিজেকে পেশ করার পর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর। তবে খন্দক যুদ্ধের দিন তিনি নিজেকে পেশ করলে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর।[২]

১. মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/১১৮৬২।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৪০৯৭।

একজন মানুষ এভাবে বাড়তে বাড়তে ৪০ বছর বয়সে উপনীত হয়। এ বয়স হলো জ্ঞান ও বিবেক শক্তির পূর্ণতা ও পরিপক্বতার বয়স। এজন্যই মুফাসসিরগণের মতে, প্রত্যেক নবীকে ৪০ বছর বয়সে নবুঅত প্রদান করা হয়েছে।[৩] যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ 'আর তিনি যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন, তখন আমরা তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম' *(ইউসুফ, ১২/২২)*। এখানে হিকমত অর্থ নবুঅত। মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বলেন, ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ 'আর তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন ও পূর্ণ বয়সে উপনীত হলেন, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/১৪)*।

'ফাতা' শব্দের অর্থও যুবক। শব্দটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথী ইউশা ইবনু নূন-এর ক্ষেত্রে ফাতা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ 'আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সঙ্গী যুবককে বলেছিলেন, দুই সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব' *(আল-কাহফ, ১৮/৬০)*। যুবক বয়সে উপনীত হওয়ার সময় উন্নতির ধারা যেমন— বুদ্ধি, শক্তি ও ভালো-মন্দ পৃথকীকরণে যোগ্যতা ইত্যাদি অব্যাহত থাকে ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত।[৪]

৪০ বছর বয়সে উপনীত হলে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উচিত— ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

অর্থ : 'হে আমার রব! তুমি আমাকে আর আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দান করেছ, তজ্জন্য শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান করো আর আমাকে এমন সৎকর্ম করার সামর্থ্য দাও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও আর আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করো, আমি অনুশোচনা ভরে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)*।

৩. তাফসীর ফাতহুল ক্বাদীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৪. তাফসীর ফাতহুল ক্বাদীর, সূরা আল-কাহফ, ১৮/৬০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যুবকদের ফযীলত সম্বলিত কিছু হাদীছ :

(১) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ 'তোমার প্রতিপালক এমন যুবককে ভালোবাসেন যার প্রবৃত্তিপূজা এবং হক্ব পথ থেকে বিচ্যুতি নেই'।[৫]

(২) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (وَفِيْهَا) شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ 'যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহর তাআলা সাত শ্রেণির মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তার মধ্যে যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গড়ে উঠেছে'।[৬]

(৩) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ। 'হাসান ও হুসাইন জান্নাতবাসী যুবকদের সরদার'।[৭]

(৪) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا (জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশের পর বলা হবে) 'তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না'।[৮]

(৫) পবিত্র অহী লেখক ও কুরআন একত্রকারী ছাহাবী যায়েদ ইবনু ছাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন যুবক। তাকে লক্ষ্য করে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ অর্থাৎ 'তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। আমরা তোমাকে কোনোরূপ দোষারোপ করি না। আর তুমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অহী লিখতে। ফলে তুমি কুরআনের সংকলন করে তা একত্রিত করো'।[৯]

(৬) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যারা যুদ্ধ করেছেন তারা ছিলেন যুবক শ্রেণির। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ 'আমরা যুবক বয়সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধ করতাম'।[১০]

(৭) আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আনছার সম্প্রদায়ে ৭০ জন যুবক ছিলেন। তাদেরকে ক্বারী বলা হতো। তারা মসজিদে থাকতেন। সন্ধ্যা হলে তারা মদীনার একপ্রান্তে গমন করতেন। তারা আলোচনা করতেন ও ছালাত আদায়

৫. আহমাদ, হা/১৭৪০৯, সনদ জায়্যেদ।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১।

৭. তিরমিযী, হা/৩৭৬৮; মিশকাত, হা/৬১৫৪, হাসান ছহীহ।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৩৭; মিশকাত, হা/৫৬২৩।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৬; মিশকাত, হা/২২২০।

১০. আহমাদ, হা/৩৭০৬, সনদ ছহীহ।

করতেন। তারা আহলে ছুফফার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করে খাদ্য ক্রয় করতেন।[১১]

যুবকের প্রকারভেদ :

যুবক তিন শ্রেণির— (ক) সৎ যুবক, (খ) বিপথগামী যুবক এবং (গ) মাঝামাঝি দিশেহারা যুবক।

(ক) সৎ যুবকের কিছু বৈশিষ্ট্য : (১) সে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার সহিত বিশ্বাসী, পরিতৃপ্ত ও খুশি হয় এবং দ্বীনের মধ্যেই সে সাফল্য ও বিজয় দেখে। আর দ্বীন হতে বঞ্চিত হওয়া সুস্পষ্ট ক্ষতি ও সর্বনাশ মনে করে। (২) সে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাতে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না। (৩) সে তার সকল বিষয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। (৪) সে সঠিকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত প্রতিষ্ঠা করে। (৫) তার ওপর যাকাত ফরয হলে সে তা হক্বদারের নিকট প্রদান করে। (৬) তার ওপর উমরা বা হজ্জ ফরয হলে সে তা দ্রুত আদায় করে। (৭) সে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়। (৮) সে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার আহ্বান করে। (৯) সে অন্যের জন্য সেটাই ভালোবাসে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (১০) সে কাউকে ভালোবাসে ও কারো সাথে শত্রুতা করে শুধু আল্লাহর জন্যই। (১১) সে বড়দের শ্রদ্ধা করে ও ছোটদের স্নেহ-মায়া করে।

এই শ্রেণির যুবকই সমাজ ও জাতির জন্য গর্বের ও মর্যাদার কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেশ-জাতি সবাই উপকৃত হয়।

(খ) বিপথগামী যুবকের বৈশিষ্ট্য : (১) সে তার আক্বীদায় বিপথগামী, চালচলনে বেখেয়াল, নিজে প্রতারিত-বিভ্রান্ত, অন্যায়-অপরাধে নিমজ্জিত, সে অন্যের থেকে সত্য গ্রহণ করে না এবং বাতিল থেকেও বিরত থাকে না। মনে হচ্ছে যে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিয়ার জন্য এবং দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র তার জন্য। (২) আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার নষ্ট ও ধ্বংস হওয়াতে সে পরোয়া করে না। (৩) সে তার দ্বীনের মধ্যে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত, চরিত্রে সে সামাজিক রীতি-প্রথা থেকেও বিচ্যুত। কিন্তু খারাপ কর্মসমূহ তার জন্য সুশোভিত করা হয়েছে ফলে সে তা ভালো দেখে, অথচ সে আমলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। এটা তার ওপর অশুভ লক্ষণ এবং সমাজের ওপর বিপদ যা তার জাতিকে নিকৃষ্ট স্তরে টেনে নিয়ে যায়। এই শ্রেণির যুবকরাই জাতির মর্যাদা ও সম্মানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(গ) মাঝামাঝি দিশেহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও দিশেহারা যুবকের বৈশিষ্ট্য : সে সঠিক ও বিপথগামী রাস্তার ক্রসিংয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। সে সত্যকে চিনেছে ও তাতে সে আস্থাশীল-নিশ্চিন্ত এবং রক্ষণশীল সমাজে জীবনযাপন করে। কিন্তু প্রত্যেক দিক দিয়ে খারাপ ও অকল্যাণের সকল পথ তার ওপর খোলা। যেমন আক্বীদায় সন্দেহ-সংশয় প্রবেশ করা, চরিত্রে বিচ্যুতি ঘটা, আমলে বিকৃতি ও ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ, ভালো রীতি-নীতি হতে বের হয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন প্রকার বাতিল স্রোত-ধারায় প্রবাহিত হওয়া। ফলে সে চিন্তা ও মানসিকতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে রয়েছে। যার দরুন সে দ্বিধাগ্রস্তের মতো একবার এদিকে আরেকবার অন্য দিকে ছুটাছুটি ও প্রত্যাবর্তন করছে। এই শ্রেণির যুবক তার জীবনে নেতিবাচক। আর এই শ্রেণির যুবকই বর্তমান বেশি। কারণ তারা কিছু ইসলামী সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও চর্চা করেছে যা বাস্তবিক তার ধারণা মতে দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক। তার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকার সংশয় থেকে মুক্ত হতে খালেছ ও নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ আলেমের কাছে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন করা।

সতর্কতা : বর্তমান যামানায় অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, ভিডিও এবং ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, তাদের মাঝে একজন রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব (জীবনবিধান) নিয়ে এসেছেন? আল্লাহ তাআলা ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্য বিবেক দিয়েছেন। অনেক যুবক আছে, যারা কুপ্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পেছনে তাদের মূল্যবান যৌবনকে নষ্ট করে। তারা পানি ছাড়াই সাঁতার কাটে এবং ডানা ছাড়াই আকাশে উড়ে। অথচ অনেক যুবক আছে, প্রতি বছর তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয়, দ্বীনের ওপর তাদের দৃঢ়তা বাড়ে, চরিত্রে উন্নতি হয় এবং তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আরও বেড়ে যায়। তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে’।[১২]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

১১. আহমাদ, হা/১৩৪৬২।

১২. তিরমিযী, হা/২৩২৯; মিশকাত, হা/৫২৮৫, হাদীছ ছহীহ।

বিদআতী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে দান-ছাদাক্বা করা প্রসঙ্গে ইসলাম কী বলে?

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দিন**

'ছাদাক্বা' শব্দটি আরবী, মূল শব্দ 'ছিদক্ব' (صدق) থেকে এসেছে, যার অর্থ আন্তরিকতা; এটি আন্তরিক বিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। এই শব্দটি তিন অক্ষরের মূল (ص د ق) থেকে এসেছে, যার অর্থ সত্য কথা বলা, আন্তরিক হওয়া এবং কারো প্রতিশ্রুতি পালন করা। ছাদাক্বার আক্ষরিক অর্থ ন্যায়পরায়ণতা এবং এটি দান বা স্বেচ্ছাসেবী দানকে বুঝায়। তবে ইসলামী পরিভাষায় ছাদাক্বাকে বিনিময়ে কোনো কিছু না চেয়ে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে কাউকে কিছু দেওয়া বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 'তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে বা কোনো নবাবিষ্কারকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবে অর্থাৎ কেউ যদি বিদআত করে, কোনো বিদআতীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, বিদআতের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করে, তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লা'নত। তার ফরয ইবাদত বা তওবা, নফল ইবাদত বা ফিদইয়া কোনো কিছুই কবুল করা হবে না...'।[১] এ প্রসঙ্গে ইমাম আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, বিদআতীর ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বা, জিহাদ, হজ্জ, উমরা, কোনো ফরয ইবাদত বা তওবা, নফল ইবাদত বা ফিদইয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপ কথা হিশাম ইবনু হাসসান রহিমাহুল্লাহ ও বলেছেন।

সুতরাং কোনো প্রকার বিদআতী কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। বিদআতীকে আশ্রয় দেওয়াও বড় অপরাধ। ফলে যেখানে কোনো গুনাহ হয়, সেখানে কোনো ধরনের সহযোগিতা করা যাবে না। আর শিরক-বিদআত যেহেতু সবচেয়ে বড় অপরাধ, সেহেতু এজন্য কোনো সহযোগিতা করাও বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা ইসলামের মহান একটি মূলনীতি। এটা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। মুআয ইবনু আনাস আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে দান-খায়রাত করে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে দান করা হতে নিবৃত্ত থাকে, আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলার জন্যই ঘৃণা করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিয়ে প্রদান করে, সে তাঁর ঈমান সুসম্পন্ন করেছে'।[২] এই হাদীছটি প্রমাণ করে যে, দান-ছাদাক্বা হবে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং তার নির্দেশিত পথে। এর ব্যতিক্রম হলে নেকীর পরিবর্তে গুনাহ হবে।

অপরদিকে আমাদের সকলের জানা অপরিহার্য যে, ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় পাপ, শিরকের পর সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক গুনাহের নাম বিদআত। তাই সব ধরনের বিদআতী আমল বা কার্যক্রম এবং বিদআতী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য ও সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে আক্বীদাগত বিদআতীদের। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদআত, বিদআতী এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। এমনকি বিদআতীকে আশ্রয় দিতেও নিষেধ করেছেন।

(১) বিদআত করলে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ 'আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হবে না' *(আন-নাহল, ১৬/১১৬)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা বিদআত করে, যার কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীআতে নেই, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা নিজেদের মনমতো আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করে।[৩] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলা হারাম কাজসমূহের অন্যতম এবং সবচেয়ে বড় পাপ। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা হয় এবং এমন কিছুকে তাঁর উপর সাব্যস্ত করা হয়; যা তাঁর জন্য শোভা পায় না, শরীআতে যা সিদ্ধ তা অমান্য করা হয় এবং যা নিষিদ্ধ তা পালন করা হয়, বাতিলকে হক্ব বলা হয় এবং হক্বকে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়।[৪]

(২) বিদআত করলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর খিয়ানতের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই দ্বীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের

---

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩১৭২, ৩১৭৯।

২. তিরমিযী, হা/২৫২১, হাসান।

৩. তাফসীর ইবনু কাছীর, ২/৫৯১।

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ১/৩৭২।

দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম' *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*।

অতএব ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও যারা ভালো কাজের দোহাই দিয়ে ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন ইবাদতের জন্ম দিয়েছে ও তাকে লালন করছে তাদের ভাবখানা এমন যেন ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ। আর এরূপ বিশ্বাস আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করল এবং তাকে উত্তম মনে করল, সে যেন ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রিসালাতে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম' *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*। সুতরাং সে যুগে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে যা দ্বীন হিসেবে গণ্য ছিল না, বর্তমানেও তা দ্বীন হিসেবে পরিগণিত হবে না।[৫]

(৩) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ আমাদের এই দ্বীনের অংশ নয় এমন কিছু উদ্ভাবন করলে তা পরিত্যাজ্য-প্রত্যাখ্যাত'। অন্য বর্ণনায় তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনী কাজের মধ্যে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে, যা তাতে নেই, তা অগ্রহণযোগ্য'।[৬]

(৪) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হামদ ও ছালাতের পর আরো বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হলো মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হলো ভ্রষ্টতা। এই ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৭]

(৫) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'যে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে বিদআত করে কিংবা কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয় কিংবা সাহায্য করে তার উপর আল্লাহ তাআলার, ফেরেশতাগণের ও সকল মানব জাতির অভিশাপ। তার কোনো ফরয কিংবা নফল ইবাদত গৃহীত হবে না'।[৮] তাই বিদআতী কাজে সহযোগিতা করা মহা অন্যায়। আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিদেরকে ভালো কাজে সহযোগিতা করতে আদেশ করেছেন এবং অন্যায়, অসৎ, হারাম ও বিদআতী কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন।[৯]

(৬) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরো বলেছেন, 'আমার পরে তোমাদের যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে সে অনেক মতভেদ দেখবে। এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে, আমার সুন্নাতকে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং এ পথ ও পন্থার উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা'।[১০]

(৭) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতীকে তওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন'।[১১] সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবলীসের কাছে অন্য যে কোনো পাপের চেয়ে বিদআত অতি প্রিয়। কেননা যে কোনো পাপ থেকে তওবার সুযোগ থাকে। কিন্তু বিদআত থেকে তওবার সুযোগ থাকে না।[১২]

(৮) ফুযাইল ইবনু 'ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি বিদআতীকে সম্মান করল, সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করতে সহযোগিতা করল। আর যে ব্যক্তি বিদআতীর সম্মুখে মুচকি হাসল, সে যেন আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা অবজ্ঞা করল।[১৩] আসাদ ইবনু মূসা রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক আসাদ ইবনু ফুরাত রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট প্রেরিত একটি পত্রে বলেন, বিদআতীর উপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। সুতরাং তাদের আসরগুলো ভেঙে দাও, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে পরিত্যাগ ও লাঞ্ছিত করেছেন; সেভাবে পরিত্যাগ ও লাঞ্ছিত করো এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হেদায়াতপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরাম তাদেরকে যেরূপ লাঞ্ছিত করেছেন, তাদেরকেও অনুরূপ লাঞ্ছিত করো।[১৪] আবূ ক্বিলাবা রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, একদা তিনি আহলে সুন্নাতের এক ব্যক্তিকে এক বিদআতী লোকের সাথে দেখে তাকে বলেন, তোমার কী হলো, এটা তো ঠাট্টা-বিদ্রুপ এর শামিল।[১৫]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত যে, কোনো অবস্থাতেই বিদআতীকে বা বিদআতী কার্যক্রমে সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে না। এখন বিদআতী প্রতিষ্ঠানে দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে করণীয় হলো, যে সকল মসজিদ ও

৫. আশরাফ ইবরাহীম কাতকাত, আল-বুরহানুল মুবীন ফীত তাছাদ্দী লিল বিদঈ ওয়াল আবাতীল, ১/৪২।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।

৭. নাসাঈ হা/১৫৭৮, হাদীছ ছহীহ।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৭১।

৯. আল-মায়েদা, ৫/২; তাফসীর ইবনু কাছীর, ২/১২; তাফসীরে কুরতুবী, ৬/৪৬-৪৭।

১০. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৬৯৪; আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; তিরমিযী, হা/২৬৭৬; মিশকাত, হা/১৬৫, হাদীছ ছহীহ।

১১. আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী ইবনু মূসা আবী বকর আল-বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), ১২/৫৪, হা/৯০১০।

১২. আলী ইবনুল জা'দ ইবনু উবাইদ আবুল হাসান আল-জাওহারী আল-বাগদাদী, মুসনাদু ইবনি জা'দ, (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতু নাদির, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), হা/১৮০৯, পৃ. ২৭২।

১৩. কিতাবু শারহিস সুন্নাহ, পৃ. ৬০, আছার নং ১৩০।

১৪. মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াযযাহ আল-কুরতুবী, আল-বিদাউ ওয়ান নাহিউ আনহা, (কায়রো : দারুস সাফা, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৪।

১৫. আল-ইবানাতু আন শারআতিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াতি ওয়া মুজানিবাতিল ফিরাক্বিল মাজমূমাহ, ২/৮৯১।

মাদরাসায় বিদআতী কর্মকাণ্ড হয় দেখতে হবে তাদের বিদআত কোন পর্যায়ের। যদি সাধারণ বিদআত অর্থাৎ আমলগত বিদআত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে দান-ছাদাক্বা করা নাজায়েয হলেও তাদের একান্ত প্রয়োজন হলে মুসলিম ভাই-বোন হিসেবে উত্তম নছীহার মাধ্যমে দান-ছাদাক্বা করা যেতে পারে। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরের ক্ষতি করা হতে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে'।[১৬]

এই হাদীছে 'তিনি তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন'- একথার ব্যাপারে ইমাম ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, একজন মানুষের ক্ষতি হস্তশিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদির ক্ষেত্রে হতে পারে। তাই তার **সহবিশ্বাসী** তাকে সমর্থন করে এবং তাকে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করার চেষ্টা করে। আর যখন সে অনুপস্থিত থাকে তখন তাকে রক্ষা করে।[১৭]

কিন্তু বিদআত যদি আক্বীদাগত অর্থাৎ শিরক, কুফরী পর্যায়ের হয়, তাহলে সেসব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদরাসায় কোনো অবস্থাতেই দান-ছাদাক্বা করা যাবে না। কারণ এতে বিদআতের সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘন কাজে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। জেনে-শুনে বিদআতী আমল করলে সেই আমল কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে তওবা করে বিদআত থেকে ফিরে আসে। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, কুরআন এবং এই কাগজে যা আছে তা ব্যতীত আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিকট হতে আর কিছু লিখে নেইনি। তিনি বলেন, এতে আছে- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মদীনা হারাম (সম্মানার্থে) আইর হতে ছওর পর্যন্ত। যে তাতে কোনো বিদআত সৃষ্টি করবে অথবা বিদআত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না। সকল মুসলিমের প্রতিশ্রুতি এক, তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার চেষ্টা করতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের লা'নত; তার ফরয বা নফল কোনোটাই গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের মালিকের অনুমতি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের লা'নত; তার ফরয বা নফল কোনোটাই গ্রহণ করা হবে না।[১৮]

সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও উছূলবিদ, আশ-শায়খুল আল্লাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.) বলেছেন, কিছু বিদআত আছে যার জন্য একজন ব্যক্তিকে মাফ করা যেতে পারে, কিছু বিদআত আছে যা ফিসক্ব (পাপ কাজ) পর্যন্ত পৌঁছে এবং কিছু বিদআত আছে যা কুফর পর্যায়ে পৌঁছে। যারা কুফর বিদআতের অনুসারী তাদের ব্যাপারে, তাদের সাহায্য করা মোটেও জায়েয নয়, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে। কারণ তার কুফরী প্রমাণিত হওয়ার পরেও বিদআতের উপর অটল থাকা মানে হলো তারা মুনাফিক্বদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ 'যখন মুনাফিক্বরা তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' *(আল-মুনাফিকূন, ৬৩/১)*।

...তাদের বিদআত প্রতিষ্ঠা বা প্রচারে দান-ছাদাক্বা করা থেকে বিরত রাখতে হবে। যদি এটা জানা যায় বা মনে করা হয় যে, তারা সেই দানের অর্থ তাদের বিদআতকে সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করবে এবং তাদের তা করা থেকে বিরত রাখা যাবে না তাহলে তাদের দান করা উচিত নয়। কারণ এটি তাদের পাপের কাজে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিদেরকে ভালো কাজে সহযোগিতা করতে আদেশ করেছেন এবং অন্যায়, অসৎ, হারাম ও বিদআতী কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন।[১৯]

এখন কেউ যদি না জেনে কোনো আক্বীদাগত বিদআতী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে দান করে তাহলে তার জন্য করণীয় হলো আল্লাহর কাছে উক্ত ভুলের জন্য তওবা করা। এই মর্মে হিজরী ৮ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) ও ইমাম শাত্বেবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, না জেনে বিদআতী প্রতিষ্ঠানে দান করলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার নিকট কঠোরভাবে তওবা করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা খালেছ তওবার মাধ্যমে শিরকের মতো ধ্বংসাত্মক, হত্যার মতো মারাত্মক ও ব্যভিচারের মতো জঘন্য গুনাহকেও ক্ষমা করার ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি স্বচ্ছ ও পবিত্র অন্তরে একনিষ্ঠ ও একাগ্রতার সাথে খালেছ তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।[২০]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ছহীহ সঠিক বুঝ দান করুন আর আমরা যেন সকল প্রকার বিদআতী আমল, বিদআতী কর্ম আর বিদআতের প্রসারে দান-ছাদাক্বা করা থেকে বিরত থাকতে পারি সে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৯১৮, হাসান।

১৭. আউনুল মা'বূদ এবং ইসলামী সওয়াল-জবাব, ফতওয়া নং ২১৯৪৪।

১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩১৭২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৭০; মিশকাত, হা/২৭২৮।

১৯. আল-মায়েদা, ৫/২; উছায়মীন লিক্বাউল বাব আল-মাফতূহ, ১/৬৬।

২০. গিয়াউল আলবাব, ২/৫৮১; আল-ই'তিছাম, ২/২৮১; মাজাল্লাতুল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪/১৮৩-১৮৫।

গাদীরে খুম ও আশূরায়ে মুহাররম

*-শেখ আহসান উদ্দীন**

হিজরী বা ইসলামী বর্ষপঞ্জির শেষ মাস যিলহজ্জ, এই মাসের ৯ তারিখ আরাফার দিন, ১০ তারিখ ঈদুল আযহা। অনেকেই বিশেষত শীআ সম্প্রদায় এই যিলহজ্জ মাসে ঈদুল আযহার এক সপ্তাহ পরেই ১৮ যিলহজ্জ তারিখে ঈদে গাদীরে খুম (عيد غدير خم) ঈদুল বেলায়াত (عيد ولاية علي) নামে উদযাপন করে। বাংলাদেশের অনেকেই একে 'মাওলার অভিষেক দিবস' নামে অভিহিত করেন। এর ১২ দিন পরেই হিজরী এক বছর শেষ হয় ও নতুন আরেক বছর শুরু হয়, যার প্রথম মাস হলো মুহাররম। এই মাসের ১০ তারিখ পবিত্র আশূরা। এই আশূরায় কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী মুসলিমরা ছিয়াম রাখে, অপরদিকে শীআ সম্প্রদায় আশূরাসহ মুহাররম মাসে কারবালায় হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর শাহাদাতের শোক পালন করে। তাই এ বিষয়ে প্রবন্ধটি লেখা হলো।

প্রথমত গাদীরে খুমের ঘটনার প্রসঙ্গে আসা যাক। মহানবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়ার আগে জীবনের শেষদিকের ঘটনাগুলো ইসলামের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মধ্যে বিদায় হজ্জ ও গাদীরে খুমের ঘটনা অন্যতম। বাংলাদেশের ও বাংলাভাষী অনেক মুসলিমই হয়তো গাদীরে খুম বিষয়ে তেমন কিছুই জানেন না অথবা এ বিষয়ে অজ্ঞ।

বিদায় হজ্জ ছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মদীনার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিদায় হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং ১৮ যিলহজ্জ তারিখে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌঁছেন ও সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। এটি ছিল মক্কা হতে তিন মাইল দূরে 'জোহফা' নামক স্থান, যা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত। এখানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি খুৎবা প্রদান করেন। এটিকে বলা হয় 'গাদীরে খুম'-এর খুৎবা। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য এই যে, 'খুম্ম' কুয়ার নিকট পৌঁছে বুরাইদা আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে ইয়ামান যুদ্ধের সফরে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর রুক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন। এতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। গাদীরে খুম-এ যখন খুৎবা প্রদান করেন তখন আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন নবীজি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বায়তের সদস্যরা সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। যোহরের ছালাতের পরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গাদীরে খুমের সেই খুৎবা প্রদান করেন। যাতে তিনি তার মৃত্যু সন্নিকটে হওয়ার ইশারা করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার তাগিদ দেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ 'আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু'।[১]

কিন্তু শীআরা উপরিউক্ত হাদীছের আলোকে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে প্রথম খলীফা হিসেবে বিশ্বাস করে, একই ধরনের কথা সদর উদ্দীন চিশতীর 'মাওলার অভিষেক ও ইসলামে মতভেদের কারণ' বইয়েও রয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, শীআরা এর অর্থ করেছে, আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু শাসন ক্ষমতাসহ সকল কাজে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত। অথচ এর অর্থ কেবল আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।[২] শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, শীআরা এখানে হাদীছ তৈরি করেছে إِنَّهُ خَلِيْفَتِي مِنْ بَعْدِي 'সে আমার পরে খলীফা' যা কোনো সূত্রেই বিশুদ্ধ নয়। বরং এটি তাদের রচিত অগণিত মিথ্যাসমূহের অন্যতম।[৩] এভাবে শীআরা রাজনৈতিক কারণে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মর্যাদা বর্ণনায় ৩ লাখ জাল হাদীছ বানিয়ে নিয়েছে।[৪]

১৮ যিলহজ্জের গাদীরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শীআ সম্প্রদায় একে ঈদে গাদীর বা ঈদুল বেলায়াত হিসেবে এবং আমাদের এই দেশে সদর উদ্দীন চিশতী নামে এক পীর লেখক ও বাউল বয়াতীদের অনুসারীরা একে মাওলার অভিষেক দিবস হিসেবে পালন করে। ইদানীং আমাদের বাংলাদেশে আবসার তৈয়বীসহ সুন্নী নামধারী একদল তাফযীলী ও শীআ প্রভাবিত বিদআতীও এই দিনকে ঈদ হিসেবে পালন শুরু করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে এই দিনে জশনে জুলুস র‍্যালীরও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শীআ সম্প্রদায় শাসিত রাষ্ট্র ইরানে এই ১৮ যিলহজ্জকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেখানে শীআরা ধুমধামে এই দিন পালন করে, সেখানে আনন্দ-ফূর্তি করে, সেদেশের অধিকাংশ রেডিও ও টিভি চ্যানেলে দিনব্যাপী

---

* সূত্রাপুর, ঢাকা।

১. আহমাদ, হা/২২৯৯৫; হাকেম, হা/৪৫৭৮।

২. মিরক্বাত, হা/৬০৯১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৭৫০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪. ড. মুছত্বফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ফীত তাশরীঈল ইসলামী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৮১।

বিশেষ অনুষ্ঠানমালাও সম্প্রচার করে থাকে। ইদানীং ইয়ামানের অনেক যায়েদী শীআও ১২ ইমামী শীআদের সাথে মিল রেখে প্রতি বছর এই কথিত ঈদে গাদীর দিবস উদযাপন করছে। বিশেষত ইয়ামানের ইরান ও লেবাননের হিযবুল্লাহ সমর্থিত সশস্ত্র দল হূছি কট্টর শীআ বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও তাদের অনুসারী সুপ্রিম পলিটিকাল কাউন্সিল বা মাজলিসু সিয়াসিল আ'লা প্রতি বছর এই ঈদে গাদীর বা ঈদুল বেলায়াত উদযাপন করছে। জেনে রাখা উচিত, এই হূছিরা পুরোপুরি যায়েদী নয়; বরং তারা যায়েদীদের উপশাখা জারুদিয়া নামক সম্প্রদায় থেকে আগত। এই জারুদিয়া শীআরা রাফেযী ও ১২ ইমামী সম্প্রদায়ের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে।

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্জে ইসলামের তৃতীয় খলীফা উছমান ইবনে আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু খারেজীদের হাতে শহীদ হন। যা ছিল একটা মর্মান্তিক ঘটনা। তাই একারণে ১৮ যিলহজ্জকে ঈদ হিসেবে পালন করাকে বিদআত বলে মনে করেন আহলুস সুন্নাহর অনুসারী অধিকাংশ মুসলিম। হাদীছে গাদীর এর নাম দিয়ে বিভিন্ন ছবিযুক্ত পোস্টার বা চিত্রাঙ্কন প্রচার করা এগুলো স্পষ্ট গোমরাহি। বিশেষত যা দেখা যায়, গাদীরে খুম এর প্রতীক হিসেবে দুই জন জুব্বা পরিহিত লোকের ছবি দেওয়া হয়, যার একজন অন্যের ডান হাত উঁচু করে আছেন, সামনে অনেক মানুষ। যেন একবিংশ শতাব্দীর সাথে তাল মিলিয়ে গাদীর উদযাপন। কিন্তু এটা করা জায়েয নয়।

ইতিহাসের আলোকে ৩৫৬ হিজরী অর্থাৎ ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের আগে কেউ এই ১৮ যিলহজ্জকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করত না। এমনকি খোদ আলী ইবনু আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ অন্য ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এমনকি ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও এই ১৮ যিলহজ্জকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করেননি।

দ্বাদশ শতাব্দীর মনীষী ইমাম শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ উনার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়্যা'-তে লিখেছেন, (রাফেযী শীআরা) 'ইহদাছে ঈদে গাদীর' অর্থাৎ ঈদে গাদীর নামে একটি নতুন ঈদ আবিষ্কার করেছে, যা ১৮ যিলহজ্জ পালন করে। আর (তাদের আবিষ্কৃত) ঐ ঈদকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়েও বেশি মর্যাদা দেওয়া এবং এটাকে ঈদে আকবর নামে অভিহিত করা সরাসরি শরীআতবিরোধী।[৫]

দ্বিতীয়ত মুহাররম মাস। হিজরী বা ইসলামী বছরের প্রথম মাস। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা চারটি মাসকে হারাম মাস বা সম্মানিত ও নিষিদ্ধ মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই চার মাস হলো মুহাররম, রজব, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ। তাই মুহাররম মাস একটি সম্মানিত ও পবিত্র মাস। এই মুহাররম মাসের ১০ তারিখ তথা আশূরা ইসলামের একটি সম্মানিত ও পবিত্র দিবস। এই মাস আল্লাহর একটা সম্মানিত মাস। এই মাসে সকল গুনাহ, শিরক-বিদআত ও খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

আশূরার দিনটি একটা ফযীলতপূর্ণ দিবস। এই আশূরায় মূসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন এবং আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে মারেন। আশূরার দিনের অন্যতম আমল হলো আশূরার ছিয়াম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখের ছিয়ামকে সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইয়াহূদীরা আশূরায় এক দিন ছিয়াম রাখত, তাই ইয়াহূদীদের বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরায় দুই দিন ছিয়াম রাখতে বলেছেন। এই ছিয়াম মূলত মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিজয়ের শুকরিয়াস্বরূপ। এই ছিয়ামের সাথে কারবালার ঘটনার কোনো সম্পর্ক নাই।

আমাদের বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে অনেক মুসলিমের মধ্যে এই ধারণা প্রসিদ্ধ যে, ১০ মুহাররম আশূরার দিনে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে নবী আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয় ও এই দিনেই তার ইন্তেকাল হয়, এই দিনে নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম হয়, এই দিনে নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেট থেকে ফিরে আসেন, এই দিনে নবী ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন, এই দিনে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

এটা সত্য যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর অনেক বছর পরে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে (৬১ হিজরীতে) এই ১০ মুহাররম আশূরার দিনেই বর্তমান ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারবালায় হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদ হন, কিন্তু অনেকেই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের কারণে আশূরাকে শোক দিবস বা শহীদ দিবস এবং মুহাররম মাসকে শোকের মাস মনে করেন। এটা সঠিক নয়। কেননা ইসলামে তিন দিনের বেশি শোক দিবস জায়েয নেই। তাই যারা মুহাররম মাসকে শোকের মাস মনে করে, তারা পথভ্রষ্ট। বিশেষ করে আমরা মুসলিম বিশ্বে দেখি মুহাররম মাস আসলেই শীআরা লাল ও কালো রঙের পতাকা-ব্যানার টানায়। তারা আশূরার দিনে শোক মিছিল, তা'যিয়া, মাতম, বুক ও মাথা চাপড়ানো, ঢাকঢোল, বাঁশি বাদ্যযন্ত্র বাজানো, শরীর রক্তাক্তকরণ বা তাতবীর, শোকগাথা ও নাওহা গাওয়া, মোমবাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজকর্ম করে,

৫. তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া (উর্দূ), পৃ. ৫১৪।

যা শতভাগ বিদআত ও হারাম। যারা এসব কর্মকাণ্ড করে তারা মূলত ১২ ইমামী শীআ, রাফেযী শীআ, ফাতেমী বা বোহরা শীআ এবং ইয়ামানের যুহি শীআ।

বাংলাদেশে ঢাকার বকশিবাজারে হোসেনী দালান ইমামবাড়া, ফরাশগঞ্জে বিবি কা রওযা ইমামবাড়া ও তার আশপাশের এলাকা, পল্টন, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর ও রাজশাহীসহ অনেক জেলায় এসব হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, লেবানন, বাহরাইন, ইয়ামান, তুরস্ক, আজারবাইজান, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, কেনিয়া ও ঘানায় শীআরা তাজিয়া মিছিল করে থাকে। বর্তমানে জাপান, পশ্চিমা বিশ্ব তথা ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশে (যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা) ও অস্ট্রেলিয়াতেও শীআরা এসব করে থাকে।

শীআদের পাশাপাশি বাংলাদেশের ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, জেনেভা ক্যাম্প কলোনীসহ এরকম অনেক অঞ্চলে, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের হালিশহর ও তার আশপাশের কিছু অঞ্চলে, খুলনা এবং নীলফামারীর সৈয়দপুরে অবাঙালি উর্দূভাষী বিহারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকজন এই আশূরায় তাজিয়া ও পাইক মিছিল বা তাজিয়াদারী করে ঢাকঢোল বাজায় ও বিভিন্ন মরসিয়া গীতি গায়। যদিও এরা নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবি করে কিন্তু তাদের মধ্যে ছহীহ আক্বীদা-মানহাজের দাওয়াহ ও তাবলীগের অভাবে তারা এসব বিদআতে আক্রান্ত। মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফেনী, রংপুর, কুমিল্লা ও চাঁদপুরসহ এরকম অনেক জেলায় কতিপয় ছূফী পীর দরবার ও তাদের অনুসারী লোকজনেরাও বিশেষত মানিকগঞ্জে গড়পাড়া ইমামবাড়ী পীর, রাজবাড়ীতে আঞ্জুমানে কাদেরিয়াসহ এজাতীয় কতিপয় পীর ও তাদের অনুসারীরাও আশূরায় তাজিয়া মিছিল করে, লাল কালো সবুজ পতাকা নিশান উড়ায় ও মোমবাতি আগরবাতি জ্বালানোর মতো বিদআতী কর্মকাণ্ড করে। অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও কৌতূহল থেকে এসব মিছিলে লোক সমাগম একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে অনেকে বিশেষ করে কতিপয় বিদআতীরা এদিন জারি গান গায়, যা শতভাগ নাজায়েয ও হারাম।

অপরদিকে নাছেবীসহ অনেকে এইদিনে এমন কিছু আমল বা কর্মকাণ্ড করে যার ভিত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও খায়রুল কুরূন এর যুগে বা তিন যুগে এর ভিত্তি পাওয়া যায় না। যেমন ১০ মুহাররমে চোখে সুরমা লাগানো, একে ফযীলত বা ছওয়াবের কাজ মনে করা, আশূরার দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করাকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ও এদিন আনন্দ-ফূর্তি করা, এদিনকে ঈদ হিসেবে গণ্য করা, বাদ্য-বাজনাসহ গান গাওয়া ও নাচানাচি করা, আতশবাজি পটকা ফুটানো, একে অপরের গায়ে পানি ছিটানো/স্প্রে করা, মেহেদি লাগানো ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশে বিশেষত মরক্কো, আলজেরিয়া, মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, কমোরোস এসব দেশের অনেক এলাকায় এসব লক্ষ করা যায়। এসব দেশে শীআদের সংখ্যা খুবই কম বা নগণ্য, এসব দেশে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাহর অনুসারী মুসলিমদের সংখ্যা ৯০-৯৯ ভাগ। এসব দেশে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে শীআ মতবাদকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। বিশেষত ১২ ইমামী ও রাফেযী শীআদের আক্বীদা মতাদর্শকে নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে মরক্কোতে অনেক জায়গায় নারী-পুরুষ একত্রে নাচ-গান, ঢোল-তবলা বাজিয়ে মিছিল শোভাযাত্রা করে ও অনেক পুরুষ বড় বড় দালানে জড়ো হয়ে হাততালি দিয়ে দুর্বোধ্য সব কর্মকাণ্ড করে থাকে, সেখানে অনেক ছূফীরাও এসব কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে।[৬]

তবে আলজেরিয়াতে এগুলো খুবই কম হয়। আলজেরিয়াতে অনেক লোক আশূরার দিনে যাকাত দিয়ে থাকে। সেদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে একদল লোক এই দিনে নাচ-গান, বাদ্যের আয়োজন করে থাকে, যাকে তারা 'সেবিবা' বলে।[৭]

এসব দেখে শীআ সম্প্রদায়ের লোকেরা আহলুস সুন্নাহর অনুসারী মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে তারা বলে, সুন্নীরা বা আহলে সুন্নাহর অনুসারীরা নাকি আশূরার দিনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের দিনে আনন্দ উদযাপন করে (নাঊযুবিল্লাহ)। কিন্তু উপরিউক্ত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ আশূরায় প্রথম পক্ষ শীআদের শোক মাতম তাজিয়াদারী এবং অপর পক্ষ যারা এই দিনে আনন্দ উদযাপন করে ঈদ হিসেবে গণ্য করে, তাদের থেকে আহলুস সুন্নাহ, কুরআন সুন্নাহর অনুসারী মধ্যমপন্থি মুসলিম সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মূলত আশূরায় শীআদের শোক পালন তাজিয়া মিছিল, মাতম আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী' ইবনু মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩ হি./৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.) তাঁর কট্টর শীআ আমীর আহমাদ ইবনু বূইয়া দায়লামী ওরফে মুইযযুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীতে ১৮ যিলহজ্জকে ঈদে গাদীর হিসেবে ঘোষণা করে। ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন

---

৬. https://youtu.be/RMTiQfAzc1c.
৭. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ashura_in_Algeria.

এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোকমিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শীআরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারী করা হলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলের ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।

আল-মুইযযু লিদীনিল্লাহি ফাতিমী (বেদ্বীন কট্টর শীআ) মিশরেও এই হুকুম জারী করে। একথা সত্যান্বেষী ইতিহাসবিদদের কাছে প্রসিদ্ধই আছে। উদাহরণস্বরূপ ইবনুল আসীর রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত আল-কামেল ফিত তারীখ, ৭/২৭৯; ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৫/২৬১ (৩৫২ হিজরীর ঘটনাবলি) ও মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী রাহিমাহুল্লাহ-এর 'ইবতালে আযাদারী' কিতাবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ দেখা যেতে পারে।

শীআ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত ১২ ইমামী ও রাফেযী শীআরা বলে, আশূরায় ছিয়াম রাখা বিদআত। কিন্তু শীআদের হাদীছ গ্রন্থে দেখা যায়, তাদের অনেক হাদীছ গ্রন্থে এই ছিয়ামের পক্ষে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ওয়াসায়িলুশ শীআ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা ৯ ও ১০ মুহাররমে ছিয়াম রাখো, এতে তোমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ হবে। তাদের ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির বলেছেন, আশূরার দিনে ছিয়াম রাখলে সারা বছরের গুনাহ দূর হয়ে যায়।[৮] তাদের পঞ্চম ইমাম মূসা আল-কাযিম বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিনে ছিয়াম রাখতেন।[৯]

আশূরায় উপমহাদেশে শীআদের তাজিয়া মিছিলে কয়েকটা ঘোড়াকে রাজকীয় কারুকার্যখচিত করে সেগুলোকে জুলজিনা আখ্যায়িত করে অনেক শীআ এগুলো নিয়ে আসে। সেই ঘোড়াকে দেখলে দুধভর্তি ছোট-বড় গ্যালন ও বোতল হাতে অনেক লোককে ছুটে আসতে দেখা যায়, এমনকি অনেক শীআ তাকে সিজদাও করে (নাঊযুবিল্লাহ)। এ তো দেখলেই বুঝা যায়, ঘোড়ার পূজা চলছে শীআদের মিছিলে, যা সুস্পষ্টরূপে শিরক।

আবার এই তাজিয়া মিছিলে অনেকে শরীর রক্তাক্ত করে, খোদ শীআ সম্প্রদায়ের অনেক আলেমও এটাকে নাজায়েয ও বিদআত বলেছেন। বিশেষত ইরানের শীআদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, ইরাকে শীআদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সিস্তানী, মুক্তাদা আল-সদর, বাকির আল-সদর, লেবাননের হুসাইন ফাযলুল্লাহ এজাতীয় অনেক শীআ আলেম এই তাতবীর বা শরীর রক্তাক্তকরণকে নাজায়েয বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শোকে গাল চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের মতো বিলাপ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১০]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইরাকের কূফাতে বসবাসরত দু'টি পথভ্রষ্ট দল সম্পর্কে আলোচনা করেন যারা আশূরার দিবসকে তাদের বিদআত বাস্তবায়ন করার জন্য উৎসব হিসেবে গ্রহণ করত। এ দুই দলের একদল হচ্ছে রাফেযী, যারা আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসা দেখায় আর ভিতরে ভিতরে তারা হয়তো ধর্মত্যাগী মুরতাদ, নয়তো কুপ্রবৃত্তির অনুসারী জাহেল। আর অপর দল হচ্ছে নাছেবী যারা ফেতনার সময় যে যুদ্ধ হয়েছে সে কারণে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।[১১]

উপমহাদেশের বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুহাররমের ১০ দিনে কিংবা অন্য কোনো সময়েও তাযিয়া, ঝাণ্ডা ও দুলদুল প্রভৃতি তৈরি করা বিদআত। এর প্রমাণ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাবেঈন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এসব জিনিস নিজেদেরই আবিষ্কৃত এবং নির্ধারিত। যার সম্মান করা 'ঠাকুর পূজা'র মতোই। হানাফী ব্রেলভী আলেম মাওলানা রেজা খান ব্রেলভী (যাকে ব্রেলভী রেজবীরা আলা হযরত বলে) বলেন, শীআদের মজলিসে ও তাদের তাজিয়া মিছিলে অংশগ্রহণ করা হারাম, তাজিয়া তৈরি করা নাজায়েয ও মুহাররমে ঢোল বাজানো হারাম।[১২]

খোদ ব্রেলবী সাহেবও এসম্পর্কে 'রিসালায়ে তাযিয়াদারী' নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিখেছেন। তাদের আলেম মাওলানা আমজাদ আলীর গ্রন্থ 'বাহারে শরীআত'-এ উল্লেখ আছে, তাজিয়া করা, সেখানে মানত করাও গুনাহ।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ বলেছেন, আশূরায় শীআদের কর্মকাণ্ড বিদআত ও গোমরাহি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সকল শিরক-বিদআত, ফেতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

---

৮. শেখ তূসি, তাযহীবুল আহকাম, শীআ আলেম খোয়েঈ-এর দৃষ্টিতে ছহীহ।
৯. তাযহীবুল আহকাম।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৭।
১১. মিনহাজুস সুন্নাহ ও ফাতাওয়া কুবরা।
১২. আহকামে শরীআত ও ফতওয়ায়ে রজভীয়া, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১০ম খণ্ড।

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

*-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

উপস্থাপনা : মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ছলনা, বাহানা ও কৌশল অবলম্বন করা শয়তানের চিরন্তন স্বভাব। মানুষের সামনে অতি খারাপ কাজকেও সে বিভিন্ন বাহানায় ভালো হিসেবে পেশ করতে পারে। যেমনটা পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'আর তারা যা করে, শয়তান তাদের সেই কর্মকে তাদের সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে পেশ করে' *(আল-আনআম, ৬/৪)*।

তাই তো আমরা দেখি মেয়েদের অধিকারের নামে তাদেরকে নগ্নতার পথে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যেটা স্বাভাবিকভাবে করা অসম্ভব ছিল। ঠিক তেমনি মানবাধিকারের বাহানায় সমকামিতার রাস্তাকে সহজ করা হচ্ছে, যেটা স্বাভাবিকভাবে করা অকল্পনীয় ছিল। ঠিক সেভাবেই সরাসরি হাদীছকে অস্বীকার করা বা হাদীছকে ছোট করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং সেটা মুসলিম সমাজকে গিলানো অনেক কঠিন। কিন্তু যখন কুরআনের শান-শওকত ও মান-মর্যাদার আড়ালে কুরআনের বিপরীতে হাদীছকে দাঁড় করানো হয়, তখন সেটা মুসলিমদেরকে বুঝানো অনেক সহজ হয়ে যায়। আজকের যুগের হাদীছ অস্বীকারকারীরা এই পদ্ধতিটাই অবলম্বন করেছে। তাদের একটাই চেষ্টা, কুরআনের বিপরীতে হাদীছকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাদীছের উপর থেকে মুসলিমদের আস্থা ও বিশ্বাস উঠিয়ে দেওয়া। কিছুদিন পূর্বে হাদীছ অস্বীকারকারী এমন একজন ব্যক্তির সাথে আমার বিতর্ক হয়। সেখানে যে দলীল-প্রমাণাদি পেশ করা হয়, সেগুলো শ্রোতা কর্তৃক আল-হামদুলিল্লাহ অনেক বেশি পরিমাণে সমাদৃত হয়। তখন থেকেই শ্রোতাদের একটা বিরাট অংশ সেই দলীলগুলো লিখিত আকারে চাচ্ছিলেন। যদিও এই বাতিল ফেরক্বার রাদ্দ হিসেবে অতীতে আমার প্রকাশিত একটি গ্রন্থ রয়েছে 'আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য' শিরোনামে; কিন্তু সেই গ্রন্থে এই দলীলগুলো সন্নিবেশিত করা হয়নি। আজকের এই প্রবন্ধে সেই বিতর্কের আলোকে শুধু কুরআন থেকে আমরা হাদীছের অপরিহার্যতা দেখব ইনশা-আল্লাহ।

(১) কুরআন ছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অহী আসত, যা কুরআন থেকে প্রমাণিত : আমাদের দাবি অনুযায়ী, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দুই ধরনের অহী প্রেরণ করতেন। একটি হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী তথা পবিত্র কুরআন। আরেকটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, যা আমাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় তার ছাহাবীদের শিক্ষা দিতেন এবং বাস্তব জীবনে তা করে দেখিয়ে দিতেন। আমাদের এই দাবির পক্ষে অগণিত ও অসংখ্য হাদীছ রয়েছে যা *আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য* বইয়ে আলোচনা করেছি। তবে আজকে আমরা এ দাবিটি কুরআন থেকে প্রমাণের চেষ্টা করব তথা আমরা কুরআন থেকেই প্রমাণ করব যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে কুরআনের বাইরেও অহী আসত।

দলীল : ১

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ 'আর যখন নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন; অতঃপর যখন সে (স্ত্রী) অন্যকে তা জানিয়ে দিলো এবং আল্লাহ তার (নবীর) কাছে এটি প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী কিছুটা তাঁর স্ত্রীকে অবহিত করলেন আর কিছু এড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি তাকে বিষয়টি জানালেন, তখন সে বলল, আপনাকে এ সংবাদ কে দিল? তিনি বললেন, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৩)*।

ব্যাখ্যা : একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী যায়নাব বিনতু জাহশ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর নিকট আসার পর দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। যা আয়েশা ও হাফছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা-এর মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে। ফলত, তারা উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাদের যার নিকটেই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসবেন তারা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, আপনি মাগাফির খেয়েছেন নাকি? উল্লেখ্য, মাগাফির হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত কোনো আঠাজাতীয় খাবার। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হাফছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর নিকটে আসলেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্নটি করেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাকে ঘটনা খুলে বলেন যে, তিনি যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর নিকট মধু পান করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি জীবনে আর কখনো মধু পান করবেন না এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তটি কাউকে না জানানোর জন্য বলেন। হাফছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা যেহেতু বিষয়টি নিয়ে আগে থেকেই আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর পূর্ব পরিকল্পনার অংশ ছিলেন, তাই তিনি আয়েশা

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -কে সবকিছু খুলে বলে দেন। বিষয়টি মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জানিয়ে দেন এবং তিনি তাকে কোনো হালাল বিষয়কে স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য নিজের উপর হারাম করতে থেকে নিষেধ করেন।

দলীলের যৌক্তিকতা : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে অহীর মাধ্যমে সেই গোপন কথা জানিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে কোথাও মহান আল্লাহ সেই বিষয়টা খুলে বলেননি যে, তিনি তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কী গোপন কথা জানিয়েছেন। তথা এই গোপন কথাটি তিনি যে তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জানিয়েছেন, তা তিনি কুরআনের বাইরে জানিয়েছেন। আর সেই জানানোর স্বীকৃতি তিনি পবিত্র কুরআনে দিচ্ছেন। তথা পবিত্র কুরআন স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কুরআনের বাইরেও অহী আসত। যেমনটি মহান আল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রীদের গোপন কথা অহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জানিয়েছেন।

দলীল : ২

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ 'আর যে ক্বিবলার উপর আপনি ছিলেন, তাকে কেবল এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়। যদিও তা অতি কঠিন (অন্যদের কাছে) তাদের ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু' *(আল-বাক্বারা, ২/১৪৩)*।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ ক্বিবলা করে দিয়েছিলেন বায়তুল মাক্বদিসের দিকে। কিন্তু আমাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম চাইতেন কা'বাকে ক্বিবলা করা হোক! এই আশায় তিনি আসমানের দিকে চেয়ে থাকতেন বারবার। পরবর্তীতে তার আশাকে পূরণ করে মহান আল্লাহ কা'বার দিকে ক্বিবলা করে দেন।

দলীলের যৌক্তিকতা : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, এতদিন আমি যে বায়তুল মাক্বদিসের দিকে ক্বিবলা করে রেখেছিলাম, এটার দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, মহান আল্লাহ কা'বার দিকে ক্বিবলা করার আদেশ পবিত্র কুরআনেই দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম যখন বায়তুল মাক্বদিসের দিকে ক্বিবলা করা হয়, সেটার আদেশ পবিত্র কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। আবার তিনিই পবিত্র কুরআনে তাঁর সেই অতীত আদেশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, আমি সেই আদেশ দিয়েছিলাম তোমাদের পরীক্ষার জন্য। তথা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে মহান আল্লাহ বায়তুল মাক্বদিসের দিকে ক্বিবলা করার আদেশ পবিত্র কুরআনের বাইরে অহীর মাধ্যমে দিয়েছিলেন। আর সেই আদেশের স্বীকৃতি তিনি পবিত্র কুরআনে দিচ্ছেন। সুতরাং কুরআন থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কুরআনের বাইরেও অহী আসত।

দলীল : ৩

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ 'অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করে আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)*।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পালক পুত্র যায়েদ ইবনু হারেছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর স্ত্রী ছিলেন যায়নাব বিনতু জাহশ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা। বিভিন্ন কারণে তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়। তালাক হয়ে গেলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -কে বিবাহ করেন। তার এই বিবাহকে নিয়ে মানুষ এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের সন্তানের বউকে বিবাহ করেছেন?! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, এই বিবাহের সিদ্ধান্তটি মূলত আল্লাহ তাআলার ছিল, যাতে মানুষের মাঝে পালক পুত্রকে নিজের পুত্র মনে করার ভুল ভেঙে যায়।

দলীলের যৌক্তিকতা : প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে। আর উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনিই এই বিবাহের বিষয়ে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে আদেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহর যে আদেশের কথা তিনি বলেছেন সেই আদেশ পবিত্র কুরআনে কোথাও নেই। তথা মহান আল্লাহ তাকে পবিত্র কুরআনের বাইরেও অহীর মাধ্যমে উক্ত বিবাহের আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে মানুষের ভুল ধারণা সংশোধনের জন্য তিনি নিজে কুরআনে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, এই আদেশ তিনি দিয়েছিলেন। সুতরাং উক্ত ঘটনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বাইরেও অহী প্রেরণ করতেন।

(চলবে)

থিংকিং ডিসকোর্স

-মাযহারুল ইসলাম*

১. শিক্ষা সংলাপ :

ভারতে মুসলিমরা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত শাসন চালায়। অতঃপর ইংরেজরা প্রায় ১৯০ বছর। তাদের শাসনামলে তারা ইসলাম ও মুসলিমের বুকে ছুরি চালায় ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বৈরাচারী শাসকেরা মুসলিমদের জাতিসত্তা ও পরিচয়কে ধ্বংস করতে আঘাত হানে শিক্ষাব্যবস্থায়। এজন্য আজকের এই শিক্ষার সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা। যা বহু আগে প্রখ্যাত পণ্ডিত M.V.C. Jaffreys বলেছেন। সেই মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য বিজড়িত ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ধ্বংসের ছুরি চালিয়েছে আজ অবধি ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তেমন কোনো আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধন লক্ষণীয় হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে ছোট সংকীর্ণ রাস্তার বদলে প্রশস্ত রাস্তার, পরিবর্তন এসেছে মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও মেজাজের। অথচ জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার শিক্ষার উন্নতির কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ইতিহাস বলছে স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। পরে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান শাসনামলে 'মাওলানা আকরম খাঁ শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সাক্ষী, পাকিস্তান আমলে এটাই ছিল প্রথম শিক্ষা কমিশন। অথচ সেই ইতিহাস বিজড়িত স্পর্শ আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের স্পর্শ করেনি! দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্যের কোনো কথা তো দূরের কথা এর নাম-গন্ধেরও ছিটেফোঁটা না রাখার অপচেষ্টায় নেমেছে আজকের তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবী ও সেক্যুলার মোড়লেরা। মুসলিমদের জীবন্ত সত্য ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বদলে রাখা হয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবী, মূর্তি আর অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো নানা ছবি ও অর্ধনগ্ন মেয়ের দেহ অবয়ব। জাতিকে সুকৌশলে মুসলিম ও মুসলমানিত্ব থেকে সরিয়ে ছবি-মূর্তির স্রোতে ভাসিয়ে নেওয়ার এক হীন, নোংরা প্রচেষ্টার পাঁয়তারা চালানোয় এক ধাপ এগিয়ে চলছে ধর্মবিদ্বেষী ও সেক্যুলার শিক্ষানীতি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষাবিদদের কী ভূমিকা ও অবস্থান তা আমাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধস মানে এ জাতির জাতীয় উন্নতি, অগ্রগতি, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি সবদিক থেকে জাতিকে মেরুদণ্ডহীন, বিকলাঙ্গ জাতিতে পরিণত করার এক গভীর ষড়যন্ত্র। থিংকিং ডিসকোর্স (Thinking Discourse) বরাবরই জট বেঁধেছে আমাদের জাতির বিবেক সমতুল্য বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের মস্তিষ্কে। নচেৎ এমন অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তবুও জাতিসত্তা ও মনুষ্যবোধ জাগ্রত হয় না কেন?

২. চলমান রাজনীতি :

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চলমান রাজনীতির হালচাল নিদারুণ সংকটজনক ও সময়ের চাহিদায় অভাবনীয় মোড়ে অবস্থান নিচ্ছে। প্রায় সকল সেক্টরে দুর্নীতি আর যুলমের শিকার হতে হচ্ছে। অবস্থার আশু পরিবর্তন কামনা করা যেন দুরূহ ব্যাপার। রাজনীতির নীতি যেন আজ রাজনীতির মোটা কভারে শৌখিন আলমারিতেই তালাবদ্ধ। গণতন্ত্রের মূল শক্তি নাকি 'জনগণ'! অথচ সেই জনশক্তির মত ও পথকে পাঁচ পয়সা পাত্তা না দিয়ে ইচ্ছামতো তাদেরকে ফুটবলের মতো লাথি মারছে। চলমান রাজনীতির অবস্থা বলে দিচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে চলমান রাজনীতি আরো অকল্পনীয় ও বেগতিক হবে। চারদিকে দুর্নীতি আর যালেমের যুলমের শিকার অসহায় আমজনতা। ক্ষমতাধারী ব্যক্তিরা নিজেদের উদরপূর্তি করার জন্য কোটি কোটি টাকা লুটপাট করে ব্যাংকে ভরে আর পাশের বাড়ির লোক তেল, মরিচ কেনার টাকার অভাবে পান্তাভাত খেয়ে কোনোমতে দিন কাটায়। এটাই চলমান রাজনীতি!

যদি পুঁজিবাদী সমাজের এলিট শ্রেণি ঠিকমতো যাকাত দিত কিংবা শতকরা আড়াই টাকা দানও করত তবুও এমন পরিস্থিতি হতো না। ইসলামের নীতিই সমাজব্যবস্থা ও জাতীয় উন্নতির জন্য যথেষ্ট। কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না, বাড়বে না নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণ হয়ে থাকে: (১) কোনো জাতি চুক্তি ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। (২) কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বাইরের বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। (৩) কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে (বিভিন্ন নাম না জানা রোগের আবির্ভাব হবে) (৪) কেউ মাপে বা ওযনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্য শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে এবং (৫) কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের উপর আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়'।[১]

প্রচলিত রাজনীতির এপিঠ-ওপিঠ একই। ভালো বলার কোনো সুযোগ নেই। নোংরা রাজনীতির হাতিয়ার জনগণ- এটা সত্য হলেও কিন্তু রাজনীতির মাঠে দিনশেষে জনতাই ক্ষতিগ্রস্ত ও অভাবের তাড়নায় দিনাতিপাত করে। ইসলামী শাসনব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত অনুসরণ করা হবে না, ততদিন পর্যন্ত আমাদের এমন নাজেহাল অবস্থা দেখতে হবে। তখন আল্লাহর দেওয়া আসমানও আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে ফুলে-ফলে ভরিয়ে দিবে না আর তারই দেওয়া যমীনও আমাদের রহমতের সোনালি ফসল উৎপাদন করবে না।

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

১. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৭৬৫।

আমরা চাই সকলের অধিকার, চাই স্থিতিশীল পরিবেশ ও আমাদের সমাজব্যবস্থা। আমরা চাই না জনগণকে নিয়ে রাজনীতি আর রেষারেষির কাদা ছোড়াছুড়ি করতে। আমরা চাই দিনশেষে আল্লাহর দেওয়া রিযিক্ব ভক্ষণ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করত বাঁচার মতো বাঁচতে।

৩. পাপ, পাপের শাস্তি ও বর্জনের মূলনীতি :

আমরা পাপ করি, কেউ পাপের ঊর্ধ্বে নই। জেনে, না জেনে, না বুঝে পাপ হয়ে যায়। অথচ পাপমুক্ত জীবন সকলের জন্য কাম্য। আমরা অনেকেই পাপ থেকে মুক্ত থাকতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি কিংবা পাপের পথে না চলতে অনেক সময় অনেক কিছু পদক্ষেপ নিই, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আমরা আবার পুরনো বা আগের পাপে জড়িয়ে যাই। ফলে অনেকেই হতাশাগ্রস্ত হই, ইবাদত করে প্রশান্তি পায় না। এমনকি পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে এক সময় ইবাদত পরিত্যাগ করে আবার পাপের মধ্যেই ডুবে থাকি। অনেকে নিরাশ হয় যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন না। যেহেতু সে অনেক পাপ করেছে। এমন অনেক চিন্তাভাবনা করে শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে আমরা অনেকেই পাপ বর্জন করে পাপমুক্ত জীবন গড়তে ব্যর্থ হই। আবার অনেক সময় কিছু পদক্ষেপ নিলেও তা ধরে রাখতে পারি না। তাই আমাদের জানা উচিত, পাপ বর্জনের মূলনীতি কী? কীভাবে আমরা পাপমুক্ত জীবন গড়তে পারি? কীভাবে পাপের পথকে রুদ্ধ করা যায়? কীভাবে সুন্দর জীবন সাজানো যায়? এমন বিবিধ বিষয়ে সামান্য কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরা হলো।

(ক) আল্লাহকে ভয় করে পাপ বর্জন করতে হবে : সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তাঁকে ভয় করে পাপ ও পাপের পথকে বর্জন করে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমি আল্লাহকে দেখছি। যদি এটা মনে করতে না পারেন, তাহলে এটা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। যদি এমন কনসেপ্ট (Concept) ধারণ করতে পারেন, তাহলেই আপনি পাপমুক্ত জীবন গড়তে পারবেন।

(খ) পাপকে সবসময় বড় মনে করবেন, কোনো পাপকে ছোট বা তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না : আমরা অনেকেই অনেক সময় পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। যার ফলে ঐ পাপ বর্জন না করে পাপের পাঠশালায় নিয়মিত শরীক হই। দিন দিন ঐ ছোট্ট পাপই কিন্তু বড় বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। তাই পাপ বলতে ছোট, বড় বাছবিচার না করে পারতপক্ষে পাপ বর্জন করে চলাই আমাদের জন্য শ্রেয়।

(গ) পাপীদের সাথে উঠাবসা না করা, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা : আমাদের পাপ বর্জন করতে না পারার আরেকটি কারণ হলো, পাপীদের তথা যারা পাপে অভ্যস্ত তাদেরকে বর্জন না করে তাদের সাথে উঠাবসা, খোশগল্প, আড্ডাবাজি, লেনদেন, মজা, তামাশা করে তাদের সাথে চলাফেরা করা।

(ঘ) পাপ করে পাপ প্রকাশ না করা : বর্তমান সময়ে পাপ করে অনেক মানুষ গর্ব করে প্রকাশ করে। অথচ পাপকে গোপন রাখতে হয়। এটা প্রকাশ করাটা যেন অহংকার, গর্বের কোনো বিষয় না হয়। বর্তমান যুবসমাজ অবৈধ সম্পর্ক করে এটা বন্ধুমহলে বলে, অভিভাবকরাও ইদানীং জোরেশোরে ১০ জনের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলে, আমার মেয়ের যে ছেলের সাথে রিলেশন করে সে অনেক ভালো। মেয়ে আমার এক নাম্বার, মেয়ে আমার অনেক ভালো নাচ জানে- এজাতীয় আরো কত পাপ প্রকাশ করা হয় তা পাঠকমাত্রই জানে।

এমন কতজন আছে, যারা পাপ করে পাপকে উসকে দেয়, পাপের দিকে মানুষকে আকর্ষিত করে। পাপ বর্জনের অন্যতম মূলনীতি হলো পাপ প্রকাশ না করা। হাদীছে কঠোরভাবে ধমক ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যে পাপ প্রকাশ করে তার ব্যাপারে।

(ঙ) পাপ করার পর ছওয়াবের কাজ করা : পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছওয়াবের কাজ করলেই তা পাপ মাফ হয়ে যায়। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একজন ছাহাবী এক মহিলাকে স্পর্শ করেন এবং সহবাস ছাড়া সব কাজ করেন। ঐ ছাহাবী পরে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, সে শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে একাজ করেছে। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু শুনে বলেন, আল্লাহ তোমার পাপ গোপন রেখেছে, যদি তুমি তা গোপন রাখতে! নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা হূদের ১১৪ নম্বর আয়াত পাঠ করে বলেন, 'তুমি ছালাত ক্বায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে'। লোকদের মধ্যে একজন বললেন, এটা কি শুধু তার বেলায় প্রযোজ্য? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, বরং সকলের জন্য'।[২]

(চ) পাপের কারণে তিরস্কার না করা : পাপের কারণে তিরস্কার না করে সংশোধনের জন্য নছীহত করা জরুরী। পরিশেষে পাপ বর্জন করে তওবা করতে পারে। সে পাপ করেছে বলে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা তার সমালোচনা করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তিরস্কার করা, অভিযুক্ত করা, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না বলা মোটেও সমীচীন নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক লোক বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ বলেন, কে আমার উপরে কসম দিতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল বরবাদ করে দিলাম'।[৩]

---

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৩।

৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/২০১৪।

(ছ) পাপ করার পর নিরাশ না হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করা : আমাদের অনেকেই পাপ করার পর নিরাশ, হতাশাগ্রস্ত হয়। বরং মুমিনদের জন্য নিরাশ, হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*।

আপনারা জানেন যে, পূর্বের যুগে একজন ব্যক্তি ৯৯ জনকে হত্যা করে, সেও কিন্তু ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাকে নিরাশ করেননি তার রহমত থেকে। তাই নিরাশা, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি রহীম, রহমান।

৪. রিযিক্ব ও ডিপ্রেশন :

আমাদের সমাজের প্রায় অনেকেই রিযিক্বের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। রিযিক্ব! রিযিক্ব! করে ছুটে চলা জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে অর্থ জোগান দেয়। রিযিক্বের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা শয়তানের প্রধান উন্মুক্ত হাতিয়ার। শয়তান মানুষকে রিযিক্বের ভয় দেখিয়ে পেরেশানিতে ফেলে। পৃথিবীর যত অন্যায় কাজ আছে তা করাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ' *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৮)*।

রিযিক্ব নিয়ে যে যত দুশ্চিন্তায় ভুগবে, তার সুখ, শান্তি ও জীবন চলার পথ তত বেশি সংকুচিত হবে। এজন্য তার একটাই মহৌষধ আর তা হলো 'তাওয়াক্কুল' তথা আল্লাহর উপর ভরসা। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কতই না চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা করতে, তাহলে পাখি যেমন সকালে খালি পেটে বের হয়ে সন্ধ্যায় পেট ভর্তি করে তার নীড়ে ফিরে, ঠিক তেমনি তোমরাও রিযিক্বপ্রাপ্ত হতে'।[৪] মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করেন রিযিক্ব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা' *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই তার তাক্বদীরের বিষয়াদি লিখে রেখেছেন। তবুও আমরা আমাদের রিযিক্বের ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত, পেরেশান হই। অথচ আল্লাহ স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছেন রিযিক্বের। তবুও আমরা আমাদের জীবিকা নির্বাহ নিয়ে প্রফুল্ল নই!

রিযিক্বের ব্যাপারে হতাশা তথা ডিপ্রেশন বরাবরই শয়তানের প্ররোচনায় মানব মনে উদয় হয়। যিনি খালেক্ব (সৃষ্টিকর্তা), তিনিই রাযযাক্ব (রিযিক্বদাতা)। ভাগ্যে যতটুকু রিযিক্ব বরাদ্দ আছে তা ভোগ না করা পর্যন্ত আপনি কিংবা আমি কেউ দুনিয়া ত্যাগ করব না। মনে রাখবেন, যেই আল্লাহ মারইয়াম (আ.)-কে বিনা মৌসুমে ফলমূল খাওয়াতে পারেন; যেই আল্লাহ সাত সমুদ্রের নিচের প্রাণীর খাদ্যের সরবরাহ ও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন; যেই আল্লাহ কাফের, অমুসলিম, নাস্তিক, ইসলামবিদ্বেষীর খাদ্যের দায়িত্বও নিয়েছেন সেই আল্লাহ আমাকে আপনাকে কি রিযিক্ব ছাড়াই রাখবেন?

বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন। রিযিক্বের ব্যাপারে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। তাহলে জীবনের সকল সমস্যা সমাধান হবে চিন্তাতীতভাবে, ইনশা-আল্লাহ।

আজকের এই চলমান মুহূর্তে অনেকেই বলছে, ২০২৩ সাল হবে ইতিহাসের রেকর্ডময় দরিদ্রতা, অভাব-অনটনের বছর। তাই অনেকেই অনেকভাবে দুর্ভিক্ষের চিন্তায় টাকাপয়সা, পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি সবকিছুই স্টক করে রাখছে এই আশঙ্কায় যে, তাকে যেন অভাব পেয়ে না বসে।

এমন যত কথাই আসুক না কেন সফলতা, রিযিক্ব, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি আর যাই হোক না কেন সবকিছু থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ ও পন্থা হলো তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা।

থিংকিং ডিসকোর্স-এ আমাদের অবস্থান দুই প্রান্তিকতায়। আমাদের অবস্থান আমরা স্পষ্ট করি না। চিন্তার দৈন্য, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ভাটা আর দায় ও দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়া জাতিতে পরিণত হয়েছি। তাই চিন্তার জগৎকে পরিশীলিত করতে হবে; পরিকল্পনা করতে হবে দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা দিয়ে। থিংকিং ডিসকোর্স-এ ফারাক কমাতে হবে, নচেৎ শিক্ষা, রাজনীতি, আত্মিক উন্নতি ও পাপের পথ বন্ধ হবে না। থিংকিং ডিসকোর্স-এ আমরা যদি আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মসমালোচনার শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমরা সেরা জাতিতে পরিণত হব বলে মনে করি এবং আমাদের যাবতীয় সমস্যাও অনায়াসে সমাধান হবে বলে প্রত্যাশা করতে পারি।

---

৪. তিরমিযী, হা/২৩৪৪, হাদীছ ছহীহ।

চোগলখোরি ও তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব

*[২২ শাওয়াল, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১২ মে, ২০২৩ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ছালাহ আল-বুদাইর** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক **আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাদেরকে সুস্থতা ও প্রত্যেক কল্যাণকর জিনিস দান করেছেন এবং চোগলখোরি থেকে নিষেধ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। আর এই সাক্ষ্য প্রদান আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে রক্ষা করবে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁকে তাঁর রব হক্ব ও সুন্নাহসহ প্রেরণ করেছেন যা আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আপনারা সেই ব্যক্তির ন্যায় তাক্বওয়া অবলম্বন করুন, যে তার মাওলাকে সর্বদা ভয় করে চলে এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

হে মুসলিমগণ! পবিত্র হৃদয়গুলো মহৎ গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসমূহের দিকে মনোযোগ দেয় আর অপরিপক্ক বিবেক অন্যায় ও নোংরামির আশ্রয় নেয়। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের মাঝে মহৎ গুণাবলির সমন্বয় করতে না পারে, অন্তত তার অন্যায়-অশ্লীলতা পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা থাকা উচিত। মানুষের মাঝে চোগলখোরি বা পরনিন্দা করা একটি নিন্দনীয় স্বভাব। চোগলখোরি করা রুগ্ন অন্তর, নিকৃষ্ট স্বভাব ও এমন মন্দ আত্মার অধিকারী ব্যক্তির কাজ যে অন্যের পর্দা বিনষ্ট ও গোপনীয়তা ফাঁস করতে উদগ্রীব থাকে।

চোগলখোরি হলো প্ররোচনা দেওয়া, ক্ষতি করা, বিচ্ছিন্ন করা, চক্রান্ত করা অথবা বিবাদ সৃষ্টি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো কথা এক বৈঠক থেকে অপর বৈঠকে পাচার করা, একজনের কাছ থেকে কথা নিয়ে অন্যের কাছে লাগানো।

চোগলখোরি হলো একটি ভয়ানক অপরাধ। এটি বিনাশকারী আগুন সদৃশ ও একটি কবীরা গুনাহ। এটি কেবল সেই ব্যক্তি করে বেড়ায় যার দ্বীনদারিতা নগণ্য, যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই এবং যার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা সুস্পষ্ট। চোগলখোর সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী; যেহেতু এমন কর্ম অন্তরের বিনাশ করে, হৃদয়ে হিংস্রতা ও মনে উত্তেজনা তৈরি করে এবং বিবেককে এলোমেলো করে দেয়। এছাড়া হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদকে উসকে দেয়।

চোখলখোরি হলো শত্রুতার বীজ, অনিষ্টের সোপান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কলকাঠি ও অপবাদের মুখপাত্র। এটি দুষ্ট লোকদের অস্ত্র, নিকৃষ্ট লোকদের অবলম্বন এবং বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টের প্রতীক। চোগলখোরির আসল রূপ হলো মানুষের গোপনীয়তা ফাঁস করা, সঙ্গীসাথির বিশ্বাস ভঙ্গ করা, তার ক্ষতির চেষ্টা করা এবং সর্বোপরি মুসলিমদের কষ্ট প্রদান করে আনন্দিত হওয়া।

হে মুসলিমগণ! মানুষের মাঝে কুৎসা, গুজব ও মিথ্যা ছড়ানো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ 'যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কী হতো? তারা তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত আর তোমাদের মধ্যে কতিপয় তা শ্রবণ করত' *(আত-তওবা, ৯/৪৭)*।

ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রক্তপাত, অবৈধকে বৈধ মনে করা, সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও বড় বড় ঘটনায় প্ররোচনা দেওয়া ইত্যাদি কি চোগলখোরি ব্যতীত হয়? জনৈক সালাফ বলেন, চোগলখোরদের এড়িয়ে যাও। কেননা এর সূচনায় রয়েছে বিষ আর সমাপ্তিতে পাপ।

এভাবে চোগলখোরির মাধ্যমে কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু দূরে সরে গেছে, সর্বদা যোগাযোগ রক্ষাকারী দুজন বন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী দুজন সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, দুজন একাত্মার মানুষ একে অপরকে ছেড়ে দিয়েছে।

এভাবে চোগলখোরের কুৎসা রটনা ও অপবাদের কারণে কত স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়েছে! সুতরাং ধিক্কার চোগলখোরদের জন্য, আবারও ধিক্কার জানাই এসব কুৎসা রটনাকারীদের।

চোগলখোরদের জন্য লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিকৃষ্টতা, অধঃপতন ও হীনতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এতে হীন কর্মে কেবল ইতর ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষই জড়িত হয়। যদি সে জানত যে, তার চোগলখোরি বা কুৎসা রটনার মাধ্যমে যে বিষ সে ছড়িয়েছে তা তার নিজের, আত্মীয়স্বজনের ও বন্ধুবান্ধবের কত ক্ষতি সাধন করেছে, তাহলে সে চোগলখোরি ও কুৎসা রটানোর চেয়ে বধির হয়ে জীবনযাপন করাকেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্যময় ও হৃদয়ের জন্য অধিক তৃপ্তিদায়ক মনে করত।

হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ 'চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার মদীনা বা মক্কার কোনো এক বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দুজন ব্যক্তির আওয়াজ পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এদের দুজনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোনো বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না'। তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকী থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর একজন চোগলখোরি করত'।[২] ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ 'আমি কি তোমাদের হুঁশিয়ার করব না, চোগলখোরি কী? তা হচ্ছে কুৎসা রটনা করা, যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে'।[৩]

হে মুসলিমগণ! ভদ্র বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন কথায় কর্ণপাত করেন না যা পরনিন্দুক, কুৎসা রটনাকারী, মিথ্যুক ও ফেতনাবাজ ব্যক্তি প্রচার করে বেড়ায়। সে ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঘৃণার বীজ বপন করে এবং শত্রুতা ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসেক্ব তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো ক্বওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ - هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ - مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ 'আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছিত। পিছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরি করে বেড়ায়, ভালো কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধী' *(আল-ক্বলম, ৬৮/১০-১২)*। অতএব, আপনারা চোগলখোর বা নিন্দাকারীর অনুসরণ করবেন না, যারা পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করে, দুজনের সুসম্পর্ক নষ্ট করার মাধ্যমে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং দুই প্রতিবেশীর মাঝে ফেতনার আগুন প্রজ্বলন করে।

যার নিকট কুৎসা বর্ণনা করা হলো এবং বলা হলো যে, অমুক তোমার ব্যাপারে এরূপ বলেছে; এমতাবস্থায় তার উপর ছয়টি কাজ আবশ্যক—

(১) তার কথা বিশ্বাস না করা; কেননা সেই চোগলখোর ফাসেক্ব, তাই তার সংবাদ পরিত্যাজ্য।

(২) এ ধরনের কাজ থেকে তাকে বারণ করা, তাকে উপদেশ দেওয়া এবং তার এমন কাজের নিন্দা করা।

(৩) আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ঘৃণা করা; কেননা সে আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ব্যক্তি।

(৪) যার বিষয়ে কথা লাগানো হয় তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ না করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)*।

(৫) লাগানো কথার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দাগিরি বা নজরদারি না করা।

(৬) সে চোগলখোরকে যা করতে বারণ করেছে তা নিজে না করা; কাজেই তার কুৎসাকে প্রচার করবে না।

চোগলখোরের কথা বিশ্বাস করা চোগলখোরির চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা চোগলখোরি করা নির্দেশ মাত্র আর তা বিশ্বাস করা স্বীকৃতিদানের নামান্তর। কাজেই আপনারা কুৎসা রটনাকারী থেকে বেঁচে থাকুন, কেননা সে যদি কুৎসা বর্ণনায় সত্যবাদীও হয় তবুও সে অন্যের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা না করার কারণে ধিকৃত।

কথিত আছে যে, জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট তার এক বন্ধু দেখা করতে আসে এবং এক ভাই সম্পর্কে কিছু কথা বলে। তখন পণ্ডিত ব্যক্তিটি তাকে বলেন, একে তো বহুদিন পর দেখা করতে এসেছ, তার উপর আবার তিনটি অপরাধ

---

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯২।
৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৬।

নিয়ে এসেছ; ঐ ভাইটিকে আমার নিকট ঘৃণার পাত্র বানিয়েছ, আমার মুক্ত হৃদয়টাকে ব্যস্ত করে দিয়েছ এবং তুমি অসত্য দ্বারা তোমার নিজেকেই কলুষিত করেছ।

আরবের লোকেরা বলে থাকেন যে, বর্ণনাকারীও একজন গালিদাতা বা কুৎসা রটনাকারী। একদা একজন ব্যক্তি জনৈক সালাফ এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, শয়তান তোমাকে ছাড়া আর কোনো দূত পেল না? জনৈক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর ক্ষিপ্ত হলে সে বলল, কীসে তোমাকে আমার উপর ক্ষিপ্ত করল? সে বলল, আমার নিকট এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে যা বলেছে তা। তখন সে বলল, যদি বিশ্বস্তই হতো তাহলে তো কুৎসা রটনা করত না। অতএব, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি যদি গ্লানি ও পঙ্কিলতামুক্ত নির্ভেজাল জীবনযাপন করতে চান, তাহলে কখনো পরনিন্দাকারীর সাথে মিশবেন না। কুৎসা রটনাকারীর সাথে উঠাবসা করা মানেই ফেতনা প্রজ্জ্বলনকারী ও অপপ্রচারকারীর সাথে চলা।

প্রবৃত্তি ও শয়তান যেন আপনাকে তার দিকে ধাবিত করতে না পারে। বরং আপনি আপনার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করুন, আপনার শ্রবণশক্তিকে মূল্যায়ন করুন; কেননা এর পিছনে আপনি আপনার দ্বীনদারিতা, জীবন ও মূল্যবান সময় থেকে যা ব্যয় করেছেন তা আর ফিরে পাবেন না।

জেনে রাখুন! কুৎসা রটনাকারীর কথা চুপচাপ শোনা ক্ষতিকর এবং তার সঙ্গ গ্রহণ করা লজ্জাজনক। পক্ষান্তরে তার নিকট থেকে দূরে থাকা তৃপ্তিদায়ক। আরো জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি আপনার নিকট অন্যের কুৎসা রটায়, সে অন্যের নিকটেও আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে বিভ্রান্তকারী প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করুন, শয়তানের প্ররোচনা হতে হেফাযত করুন এবং আমাদের হৃদয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন না করে সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ রাখুন, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ নয় বরং ভালোবাসা পোষণকারী করুন।

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين...

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে সে হেদায়াতের উপরে থাকবে আর যে তাঁর নাফারমানী করবে সে পথভ্রষ্ট হবে এবং তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আপনারা আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্য হবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো' *(আত-তওবা, ৯/১১৯)*।

হে চোগলখোর, প্রতারক ও ফেতনাবাজ! তোমাকে তোমার প্রবৃত্তি চালনা করছে, ফলে তা হতে তুমি মুক্ত হতে পারছ না। হে ক্ষতির ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তি! তোমাকে ইতোমধ্যে ধ্বংস পেয়ে বসেছে। হে নিজের সুস্থতায় প্রতারিত ব্যক্তি! তোমার দিকে মৃত্যু তার ফাঁদ পেতে রেখেছে।

আপনি একবার এ আবাস ছেড়ে অন্তিম যাত্রার কথা চিন্তা করুন! এখনি আপনার রবের নিকট তওবা করুন, কুৎসা রটানো ও অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি চোগলখোরির মাধ্যমে যাদের উপর অন্যায় করেছেন তাদের সাথে মীমাংসা করে নিন। যাদেরকে কষ্ট দিয়েছেন তাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করুন এবং যাদেরকে কুৎসা রটনার মাধ্যমে পেরেশানিতে ফেলেছিলেন তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। তবে যদি তা বলতে গেলে বা মীমাংসা চাইতে গেলে কোনো ফেতনা বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে আপনার জন্য তাকে অবগত করানো বা তার কাছে মীমাংসা চাওয়া জরুরী নয়। বরং এ অবস্থায় আপনি তার জন্য বেশি বেশি দু'আ ও ইস্তিগফার করুন, তার বেশি বেশি প্রশংসা করুন এবং তার প্রতি ইহসান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন। শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন এবং দ্বীনের শত্রুদের ধ্বংস করুন। আমাদের দেশ সঊদী আরবসহ সকল মুসলিম দেশকে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষীদের বিদ্বেষ এবং হিংসুকদের হিংসা থেকে হেফাযত করুন।

হে আল্লাহ! সকল স্থানে আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে আপনি রক্ষা করুন। হে পরম দয়ালু! আপনি তাদের রক্ত, মান-ইযযত, ধনসম্পদ ও দেশকে হেফাযত করুন। হে আল্লাহ! তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করুন- আমীন!

ফেসবুকে আপনি কোন পথে যাচ্ছেন

*-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী**

বর্তমান ডিজিটাল যুগে প্রতিটি মানুষেরই হাতে হাতে রয়েছে স্মার্টফোন। প্রযুক্তির বিশ্বায়নের ফলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে আমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও এই স্মার্টফোন এখন বিনোদনেরও একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

আধুনিক যান্ত্রিক বন্দিত্বের জীবনে একটুখানি স্বস্তির আশায় কিছুটা বিনোদন নিতে আমরা প্রতিনিয়তই ঢু মারি বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায়। তেমনই একটি জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া হলো 'ফেসবুক'। যার জনপ্রিয়তা আজ পৃথিবীজুড়ে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও আজ ফেসবুকে জটিলভাবে আসক্ত। আজ আমরা জানার চেষ্টা করব এই আসক্তির কারণে ফেসবুকে আমরা কোন পথে যাচ্ছি।

সময়ের সাথে সাথে আমাদের জীবনে যান্ত্রিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ফেসবুক হচ্ছে সেই একঘেয়েমি জীবনের একটি ভার্চুয়াল জানালা। যে জানালায় দাঁড়িয়ে আমরা পুরো দুনিয়া দেখার চেষ্টা করি। জানালায় দাঁড়িয়ে যেমন বাইরের ভালোমন্দ সবকিছু দেখা যায়, ঠিক তেমনি ভার্চুয়াল জানালা ফেসবুকেও ভালোমন্দ সবকিছুই আছে। মানুষের ভালোমন্দ নির্ভর করে তার নফসের উপর। যে নিজের নফসকে যত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে তত ভালো এবং আল্লাহর কাছে সফল।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিজেদের নফসের কাছে হেরে গিয়ে ফেসবুকের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। যা তাদেরকে জাহান্নামের গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমাদের জানা উচিত, ফেসবুকে আমরা কী করছি আর কী করা উচিত। কেননা অধিকাংশ মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করলেও তারা এর ভালোমন্দ কিছুই জানে না। অথচ এই ফেসবুকই একজন মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কেননা ফেসবুক হচ্ছে একটি অনৈইসলামিক প্রতিষ্ঠান। যারা এর তত্ত্বাবধানে আছেন তারা দ্বীনের উদ্দেশ্যে এই অ্যাপস চালু করেনি। বরং মানুষকে বিভ্রান্ত করে টাকা উপার্জনই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টাই থাকে টাকা আয় করা। আর আমরা ভালোভাবেই জানি, সৎপথে টাকা উপার্জন খুবই কষ্টকর। তাই দুনিয়ার রীতি হচ্ছে অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করা। এই কারণে ফেসবুকও তার ব্যবহারকারীদের অনৈতিক পথে যেতে বাধ্য কিংবা উৎসাহিত করে।

বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের অনৈতিক এডাল্ট কন্টেন্টের মাধ্যমে তারা প্রলুব্ধ করে। একই সাথে বিভিন্ন এজেন্সি রয়েছে যারা এই জাতীয় অনৈতিক কাজে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের কাজে লাগায়। আমরা হাত বাড়ালেই ফেসবুকে অশ্লীল ভিডিও ছবি বা অশ্লীল কন্টেন্ট দেখতে পাই। প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সাইট থেকে অশ্লীল এ্যাড আসে। যারা জেনে কিংবা না জেনে এসব অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে তারা সহজেই গুনাহগারে পরিণত হয়।

আমরা যারা শুধু বিনোদনের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করি, তাদের অধিকাংশই জানি না কীভাবে এসব খারাপ অশ্লীল সাইট বা এ্যাডগুলো বন্ধ করতে হয়। যার ফলে শুধু বিনোদনের জন্য ফেসবুকে ঢুকলেও, দুনিয়াবী বিভিন্ন অডিও-ভিডিও দেখার কারণে তার সাথে কিছু গুনাহ ফ্রি হিসেবে আমাদের আমলনামায় যুক্ত হয় প্রতিনিয়ত।

আমরা হাসি-ঠাট্টার ছলে অনেক অশালীন ছবি ভিডিও পোস্ট কিংবা শেয়ার করি, যা নৈতিকতা এবং ইসলামবিরোধী। এইসব ছবি ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে, নিজে যেমন গুনাহগার হচ্ছি, ঠিক তেমনি অন্যজনকেও গুনাহগার করার অপরাধে তার অপরাধও আমাদের কাঁধে নিচ্ছি। কেননা ইসলামে যে অপরাধ করে এবং তার কারণে অন্য কেউ গুনাহ করলে প্রথম ব্যক্তির শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়।

একইভাবে ফেসবুকে বিপরীত লিঙ্গের সাথে অশালীন ও অনৈতিক কথাবার্তা বা ভিডিও-চ্যাট করার মাধ্যমেও যেমন গুনাহগার হচ্ছি, ঠিক তেমনি এর মাধ্যমে অন্যান্য পাপেরও সন্ধান পাচ্ছি। এমন একটি পাপ হচ্ছে জুয়া। ফেসবুকের বদৌলতে আজ আমরা সহজেই অনলাইন জুয়ায় লিপ্ত হতে পারি। আর দ্বীন সম্পর্কে অধিকাংশ অবুঝ মানুষ এসব জুয়ার

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

ফাঁদে পা দিয়ে আজ সর্বাশান্ত এবং পাপের সাগরে নিমজ্জিত।

ফেসবুক শুধুই খারাপ, এটা বললে অবশ্যই অবিচার করা হবে। অবশ্যই ফেসবুক ভালো- যদি আপনি তা ভালো পথে পরিচালিত করেন। বিশেষ করে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে ফেসবুকের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ফেসবুককে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বিনোদন হিসেবেই ব্যবহার করে।

এমনকি ফেসবুকে কোনো দ্বীনের দাঈ যদি কাউকে ভালো নছীহত করে, অধিকাংশ মানুষ এর বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের মতে যেখানে-সেখানে ইসলাম আনা যাবে না। ফেসবুক তো ফেসবুকই এখানে কেন ইসলাম আসবে ইত্যাদি অসার কথা, যা গোমরাহি বা পথভ্রষ্টতার কথা।

সুতরাং আমরা নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও, ফেসবুকের কারণে যেমন গুনাহগার হচ্ছি, ঠিক তেমনি কেউ দ্বীনের নছীহত দিলে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছি। যা আমাদের অধিকাংশ ফেসবুক ব্যবহারকারীই জানে না। আমরা হাসি-তামাশার ছলে ফেসবুক ব্যবহার করি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ‘অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়, নম্র। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১-৩)*। অর্থাৎ যারা অহেতুক অপ্রয়োজনীয় অনর্থক কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে না, তারা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সফল। আর যারা সফল, তারাই আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে।

সুতরাং শুধু বিনোদনের উদ্দেশ্যে অহেতুক ফেসবুক ব্যবহার করলে কখনোই সফলতা পাওয়া যাবে না। কেননা ইসলামে প্রতিটি কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। তাই ফেসবুককে কখনোই খারাপ উদ্দেশ্য ব্যবহার করা যাবে না। আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমরা এই ফেসবুকের মাধ্যমে কোন পথে আছি এবং যাচ্ছি। একইসাথে এটাও চিন্তা করা উচিত, আসলেই আমাকে কোন পথে যাওয়া উচিত।

ফেসবুক ব্যবহারে ইসলামের সরাসরি কোনো বাধা নেই। তবে আপনি কী নিয়্যতে ফেসবুক ব্যবহার করছেন, সেটাই হচ্ছে মূল বিষয়। আমরা এর মাধ্যমে ভালো কিছু যেমন দ্বীন প্রচার বা দ্বীন ইসলামকে সকলের মাঝে তুলে ধরা এবং কিছু ভালো নছীহত করা যা মানুষের কল্যাণে আসবে। সর্বোপরি ভালো নিয়্যতেই ফেসবুক ব্যবহার করছি কিনা দেখতে হবে। যদি আমাদের নিয়্যত হয় এর মাধ্যমে দুনিয়াবী তথা সকলের সাথে যোগাযোগ এবং নিজেদের তথ্য আদানপ্রদান, একইসাথে আখেরাত তথা দ্বীনী নছীহতসহ মানুষের কল্যাণে কাজ করা হলে তা অবশ্যই নেকীর কাজ হবে।

আর আমরা শুধু বিনোদন এবং দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যদি ফেসবুক ব্যবহার করি, তাহলে তা আমাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নামের রাস্তায় নিয়ে যাবে। কেননা ফেসবুকসহ অধিকাংশ সোস্যাল মিডিয়ায় আজ নগ্নতা এবং অনৈসলামিক কন্টেন্টের ছড়াছড়ি। যা প্রতিটি ব্যবহারকারীকেই পাপের সাগরের গা ভাসাতে প্রলুব্ধ করে। আর এভাবেই নিজেদের নফসের ডাকে সাড়া দিয়ে অধিকাংশ ফেসবুক ব্যবহারকারী শয়তানের সাথী হয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়।

তাই আমাদের আজ এই পরিস্থিতিতে চিন্তাভাবনা করা উচিত ফেসবুকে আমি কী করছি আর কী করা উচিত? আমরা কি ভালো নিয়্যতে ফেসবুক ব্যবহার করে দুনিয়া এবং আখেরাতের সন্ধান করব? নাকি দুনিয়ায় আনন্দ-উল্লাস অশ্লীল বিনোদনে জড়িত হয়ে জাহান্নামের পথে যাব? তাই আসুন! ফেসবুককে দ্বীন এবং দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিজেদের আখেরাতকে সমৃদ্ধ করি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

মৌচাক মধু
দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন-০১৭৮২-৪৬৪০৯৮
মৌচাক মধু কালোজিরা ও জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
মৌচাক মধু কালোজিরার তেল ১০০% খাঁটি ১০০% গ্যারেন্টি ভেজাল প্রমানে দশ হাজার টাকা পুরষ্কার

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত
BSTI
লাইসেন্স নং রাজশাহী-৫৫১৮
যোগাযোগ
প্রত্যাশা লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮
প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭
দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলাও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

ভ্রান্ত সুন্নীদের গুরু আহমাদ রেজা খানের ইতিহাস

-সাঈদুর রহমান*

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ বেনিয়ারা নামে মুসলিম আর কর্মে শিরক ও বিদআত সম্পাদনকারী কিছু লোক খুঁজছিল। কারণ ইংরেজরা ভালো করেই জানে, মুসলিম জাতি হলো বীরের জাতি। তারা যদি একতাবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের অন্তরে গ্রথিত ভারত শাসনের রঙিন স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবে তা কখনোই ধরা দিবে না। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত দু'জন ব্যক্তিকে অবশেষে পেয়ে গেল। একজন হলো মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং অপরজন হলো আহমাদ রেজা খান। এই দু'জন ব্যক্তির মাধ্যমে ভারতীয় মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা দু'জন মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করে। একজন নিজেকে নবী দাবি করে আর আরেকজন অলী-আউলিয়া ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। আজ পাঠক সমীপে আহমাদ রেজা খানকে নিয়ে কিছু কথা লিখব। আমরা আশাবাদী অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহল অবশ্যই উপকৃত হবেন ইনশা-আল্লাহ। তো চলুন জেনে আসি রেজা খান সম্পর্কে। আর হ্যাঁ, কথিত সুন্নীরা[১] আহমাদ রেজা খানকে আলা হযরত নামেও ডাকে!

জন্ম : আহমাদ রেজা খান ১৪ জুন, ১৮৬৫ সালে ভারতের উত্তরপ্রদেশের বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করে। তার জন্ম হয় এক সাহিত্যমনা পরিবারে। তার বাবা নকী আলী ও তার দাদা রেজা আলী হানাফী মাযহাবের আলেম ছিল। তার মা তার নাম রাখে আমান মিয়া। তার বাবা তার নাম রাখে আহমাদ মিয়া। তার দাদা তার নাম রাখে আহমাদ রেজা। কিন্তু সে সবার নাম উপেক্ষা করে নিজের নাম দেয় আব্দুল মুস্তাফা।[২]

স্বভাব : সে ছিল বদমেজাযী ও রাগী স্বভাবের। তার মুখের ভাষা ছিল নেহায়েত নোংরা। সে তার বিরোধী লোকদের গালাগালি করত। যেমন- সে তার বিরোধীদের বলত, শয়তান, অভিশপ্ত, ইবলীসের ভেড়া, দাজ্জালের গাধা, মুনাফেক্ব, ওয়াহাবী, নজদী ইত্যাদি। দেওবন্দী ও গায়রে মুক্বাল্লিদদের সে জাহান্নামের কুকুর বলত। শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহিমাহুল্লাহ-কে সে বলত, বিদ্রোহী, শয়তান, অভিশপ্ত ও সম্মানহীন লোক।[৩] সে আরও বলত, ওয়াহাবীদের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা করা যাবে না। তাদের সাথে বিবাহ-শাদী দেওয়া যাবে না। তাদের মসজিদে টাকা দেওয়া জায়েয নেই। সে মুসলিমদের ঢালাওভাবে কাফের বলত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, আল্লামা ইকবাল ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে কাফের বলে ঘোষণা দেয়।[৪]

সুধী পাঠক! বর্তমানেও আপনি দেখতে পাবেন, তার অনুসারী কথিত সুন্নীরা আহলেহাদীছ ও দেওবন্দীদের কাফের, ওয়াহাবী, নজদী বলে থাকে। তারা আরও বলে, ওয়াহাবীদের পেছনে ছালাত বিশুদ্ধ হবে না, তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া বা তাদের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয হবে না। কথাগুলো যাচাই করার জন্য ইউটিউবে সার্চ দিলেই তাদের বক্তাদের গালিগালাজ শুনতে পাবেন। আপনি দেখতে পাবেন আহমাদ রেজা খানের সাথে তাদের কত মিল! সে যেমন হক্বপন্থী আলেমদের গালিগালাজ করত, বর্তমানে তার অনুসারীরাও গালিগালাজ করে। আমরা আল্লাহর কাছে এই কাজ থেকে আশ্রয় চাই।

তার শিক্ষক : তার শিক্ষক ছিল মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ। রেজা খানের বাবা ও দাদা হানাফী মাযহাবের আলেম হলেও তার বিরোধীরা বলছেন, তারা শীআ মতাদর্শী ছিল। তবে একটা কথা নিশ্চিত বলতে পারি, রেজা খান অবশ্যই শীআদের আদর্শ লালন করত। যার প্রমাণ মিলে তার বই-পুস্তক থেকে। তার অনুসারীদের মাঝে বর্তমানে শীআপ্রীতি বিদ্যমান। মাথায় শীআদের মতো টুপি, গায়ে শীআদের মতো কাপড়, হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি আর ইয়াযীদকে গালমন্দ করা, নিজেদের ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশধর দাবি করা, আরও কত কী! ভালো করে অবলোকন করুন তাহলেই শীআদের আদর্শ যে তাদের মাঝে রয়েছে তা প্রতিভাত হয়ে যাবে।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. উল্লেখ্য, সুন্নী একটি স্বীকৃত পরিভাষা, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃস্বার্থ অনুসারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কথিত সুন্নীরা নিজেদের বিভ্রান্তি সহজে চালিয়ে দেওয়ার জন্য নামটি নিজেদের ক্ষেত্রে অপব্যবহার করে।

২. বেরেলভী মতবাদ, আকীদা বিশ্বাস ও ইতিহাস, পৃ. ২৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

আয়ের উৎস : তার ভক্তরা অতিরঞ্জন করে বলে, তার নাকি তালাবদ্ধ সিন্দুক ছিল, সেখান থেকে সে টাকা-পয়সা, অলংকার, গহনা, কাপড়চোপড় যা ইচ্ছে বের করত। আসলে বিষয়টা তা নয়। আসল ঘটনা হলো সে ছিল ব্রিটিশদের দালাল। তারা তাকে সহযোগিতা করত। আরো একটা কথা হলো তার সম্পত্তি ছিল দান ও মানুষের আমানত। মানুষ তাকে জ্ঞানী মনে করে আমানত রাখত আর সে এগুলো ভোগ করত।[৫]

অভ্যাস : সে সর্বদা পান চিবাতো। সে এতই পান চিবানোতে অভ্যস্ত ছিল যে, ইফতারের পরই সে পান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। সে হুকা ভীষণ পছন্দ করত। হুকা পানের সময় সে বিসমিল্লাহ বলত না, যেন শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে। তার আরও অভ্যাস ছিল মানুষের পদচুম্বন করা। কেউ হজ্জ করে ফিরে আসলে সে তার পদচুম্বন করত।[৬] বর্তমানে তার অনুসারীরাও কদমবুসি করাকে খুব ভালো কাজ মনে করে।

বাচনভঙ্গি : সে অনর্থক ও অর্থহীন শব্দ বেশি ব্যবহার করত। এর দ্বারা সে নিজেকে জ্ঞানী বুঝাতে চাইত। কারণ ওই সময় নিয়ম ছিল, যে যত জ্ঞানী তার ভাষা তত দুর্বোধ্য। সে তার বিরোধীদের ব্যাপারে কঠিন শব্দ ব্যবহার করত। কুকুর, শূকর, লম্পট আরো কত কী!

রচনাবলি : তার ভক্তরা অতিরঞ্জন করে বলে, সে ২০০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৩৫০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৪৪০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৫০০টি বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ৬০০-এর অধিক বই লিখেছে। আবার কেউ বলে, ১০০০০-এর অধিক বই লিখেছে। কিন্তু আসল কথা হলো তার রচিত বই ১০-এর অধিক নয়।[৭]

জিহাদের বিরোধিতা ও ইংরেজদের সমর্থন : তদানীন্তন সময়ে যারাই জিহাদের কথা বলত, সে তাদের ওয়াহাবী, নাজদী, কাফের বলত। রেজা খান ব্রিটিশদের বাছাইকৃত লোকদের মাঝে শীর্ষে ছিল।[৮]

সে ওই সময় জিহাদ করা যাবে না বলে ফতওয়া দেয়। ভারতকে দারুল হারবের পরিবর্তে দারুল ইসলাম বলে। অথচ সব আলেম দারুল হারব বলেন। সে এ বিষয়ে চটি বই লেখে। এর নাম দেয়, إعلام الإعلام بأن هندوستان دار الإسلام। (ই'লামুল ইলাম বিআন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম) এই বইয়ে সে ওয়াহাবীদের কাফের, মুরতাদ আখ্যা দেয়। আরও লিখে তাদের ক্ষমা করা যাবে না। তাদের পেছনে ছালাত হবে না, তাদের যবেহ করা পশু খাওয়া যাবে না, তাদের সাথে সামাজিক আচরণ চলবে না, তাদের একঘরে করে রাখতে হবে। তাদের নারীদের দাসী বানানো উচিত।[৯] সে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। সে বলে, জিহাদ ভারতে ফরয নয়। জিহাদ থেকে মানুষকে ফিরানোর লক্ষ্যে সে বলত, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকো। তোমরা সঠিক পথে থাকলে তোমাদের কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহর কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তোমরা যা করেছ সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন' *(আল-মায়েদা, ৫/১০৫)*।

ওই সময় ভারতীয় আলেমরা তুর্কি খেলাফত পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চাইলে সে বলে, ফিরানোর প্রয়োজন নেই। কারণ খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত। আর তুর্কিরা কুরাইশী নয়।[১০]

ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালের পর থেকে আলেমদের ফাঁসি ও কারাবদ্ধ করা শুরু করে এবং নানা নির্যাতন করে তাদের জীবন বিষিয়ে তোলে। তারা আলেম ও সাধারণ মিলে ১ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। আর ওই সময় সে দিব্যি আয়েশ করে চলছিল। তাকে ব্রিটিশরা কিছুই বলছিল না। যে সকল আলেম কারারুদ্ধ হন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ।[১১]

ব্রিটিশ সাংবাদিক ফ্রান্সিস রবিনস বলেন, রেজা খান ব্রিটিশদের সমর্থক ছিল। ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনের সময় সে ব্রিটিশদের একজন মদদদাতা ছিল। ওই সময় সে তার অনুসারীদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করে, যারা সবাই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিল।[১২] রেজা খান

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

এতটাই ইংরেজ প্রেমিক ছিল, যার দরুন তার অনেক ভক্ত তাকে ছেড়ে চলে যায়। কারণ তারা কিছু হলেও বুঝত।[১৩]

সুতরাং আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, সে ইংরেজদের দালাল ছিল। কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো তার ভক্তরা তার বিষয়টা ঢাকার জন্য হক্বপন্থি আলেমদের ইংরেজদের দালাল বলে থাকে। এ যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা। সে যদি ইংরেজদের দালাল না হতো, তাহলে কীভাবে এত আয়েশ করে চলত?

তার বিশেষ কিছু আক্বীদা :

সে পীর, অলী-আউলিয়াদের ভক্তি করে আল্লাহর আসনে বসিয়ে দিয়েছে। আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাহিমাহুল্লাহ-কে অতি ভক্তি করে আল্লাহর চেয়ে বড় বানিয়ে দিয়েছে। তার নাম দিয়েছে গাউছুল আ'যম (মহান সাহায্যকারী)। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানেন, তিনি তার উম্মতের আমলের খবর রাখেন, তিনি হাযির নাযীর, তিনি পৃথিবী থেকে মৃত্যুবরণ করেননি, বরং তিনি জীবিত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হতো না। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা। তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ 'হে মানব সকল! দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে'।[১৫] অন্যত্র নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, أَلَا هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 'সাবধান! চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়েছে'। তিনি একথা তিন বার বললেন।[১৬]

মীলাদ মাহফিল করা, কবরপূজা, মাযারপূজা, পীরের পায়ে সিজদা করাসহ আরো অসংখ্য শিরকী আক্বীদা তার রয়েছে।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৪৫।
১৫. ইবনু মাজাহ, হা/৩০২৯, হাদীছ ছহীহ।
১৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৮, হাদীছ ছহীহ।

আমরা আশ্চর্য হই আহমাদ রেজা খানের আগে কত বিদ্বান গত হয়েছেন, কত বইপুস্তক প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন, তিনি নূরের তৈরি, তিনি হাযির নাযীর। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারী গ্রন্থ লিখেছেন, সেখানে কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন! কই তিনি তো আলোচনা করেননি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন বা তিনি নূরের তৈরি, তিনি হাযির নাযীর। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরও কত বড় বড় বিদ্বান গত হয়েছেন, কেউ তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করেননি। সর্বপ্রথম সেই মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার মানসে ও ইংরেজদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই অনর্থক বিষয় নিয়ে আলোচনার ঝড় তোলে।

সুধী পাঠক! আমরা বলব, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি এটা বললে কি আপনার ছওয়াব হবে? হবে না। তাহলে কেন এই অনর্থক বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করেছে? অবশ্যই এর পেছনে কোনো রহস্য লুক্কায়িত আছে। আমরা হলফ করে বলতে পারি, ইংরেজদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই সে এগুলো করেছে। আপনি তাদের বক্তাদের দেখবেন এই আক্বীদা-বিশ্বাসগুলোই ওয়ায মাহফিলে বলে বেড়ায় আর জনতার মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাদের মতের বিরোধী আলেমদের গালিগালাজ করাই যেন তাদের ইবাদত। আর তারা গালি দিবে না কেন! তাদের গুরু আহমাদ রেজা খানই তো গালাগালি করত। একটা হাদীছ আছে, وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ 'জারজ সন্তান তিন নম্বর দুষ্ট'।[১৭] এ হাদীছটা বলা হয় তখন, যখন দুষ্ট পিতার সন্তান তার থেকে বেশি দুষ্ট হয়। আহমাদ রেজা খান আলেমদের কুকুর, শূকর, লম্পট, হীন লোক, কাফের বলত। কিন্তু সে জারজ সন্তান বলত না। তার অনুসারীরা বর্তমানে একধাপ এগিয়ে। তারা বলে, ওয়াহাবীরা জারজ সন্তান। আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াত দান করুন- আমীন!

মৃত্যু : ১৯২১ সালে ৬৮ বছর বয়সে সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যু সম্পর্কেও আজগুবি কিছু কথা আছে। যেমন বলা হয়, তার লাশ বহন করে ফেরেশতাদের একটি দল। তার কবর থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। আরো কত কী! এক কথায় যদি বলি, তার সম্পর্কে তার ভক্তরা যা বলে সবই মিথ্যা।

আল্লাহ তাআলা তার ও তার অনুসারীদের ভ্রষ্টতা থেকে জাতিকে হেফাযত রাখুন- আমীন!

১৭. আবূ দাঊদ, হা/৩৯৬৩, হাদীছ ছহীহ।

অবুঝ শিশুর কাছে বাবার প্রত্যাশা

*-এম কাউছার হামিদ**

তুমি আমার স্বপ্ন। আমার জান্নাত। তুমি আল্লাহর দেওয়া বড় নেয়ামত। তোমায় পেয়ে আমরা গর্বিত। এই তো কদিন আগেও তুমি কিছুই ছিলে না। আজ দুনিয়ার আলোতে বিচরণ করছ। পিতা-মাতার মুখে হাসি ফুটিয়েছ। ধীরে ধীরে বড় হতে চলেছ। কিছুদিন পর কথা বলা শুরু করবে। বাবার দাড়ি ধরে খেলা করবে। বাবা বলে ডাক দিবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিবে। তোমার প্রথম বাক্যটি যেন হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- তোমার আম্মু সে চেষ্টাই করে যাচ্ছে।

তুমি আমাদের প্রথম সন্তান। মেয়ে হয়ে জন্মেছ। এতে আমরা বেশি আনন্দিত। তোমাকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারলে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে। তুমি আমাদের রিযিক্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবে। তোমার বাবা এখনো ছাত্র। এতে কিছু আসে যায় না। তোমাকে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট। মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞ।

তুমি মেয়ে হয়েও অনেক কিছু করতে পারবে। তোমাকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি। দ্বীনী স্বপ্ন। তুমি সেটা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এ আশাই রাখি। সুসন্তানরূপে গড়ে উঠবে। সে চেষ্টাও করি।

তোমার নাম রুফায়দা। এর অর্থ জানো? কেন রেখেছি এই নাম। অনেকে ভিন্ন নাম রাখতে চেয়েছিল। আমি রাখতে দেইনি। রুফায়দা নামে একজন মহিলা ছাহাবী ছিলেন। তিনি অনেক জনসেবামূলক কাজ করতেন। ডাক্তার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধাহত ছাহাবীদের তার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিতেন। এই নামের এক অর্থ সাহায্যকারী। তিনি অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। আরেক অর্থ প্রতিনিধি। তিনি পুরুষের মতো সাহসী ভূমিকাও পালন করতেন। তুমিও এই ছাহাবীয়ার মতো হবে। তার নামের দ্বারা প্রভাবিত হবে। এটাই কামনা।

তোমার প্রতি বাবার ভালোবাসা অপরিসীম। কাগজে-কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ ভালোবাসাটা তো স্বভাবগত। কলিজার সাথে মিশ্রিত। তোমার হক্ব আদায়ে আমরা সচেষ্ট। তবে একটা বিষয়ে আমি শঙ্কিত। মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতকেই সর্বদা প্রাধান্য দিতে হবে। নতুবা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারব না। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমনটাই বলেছেন। এই হাদীছ পড়ে আমি কেঁদেছি। অনেক কেঁদেছি। ভেবেছি ছাহাবায়ে কেরাম এসবের মায়া ত্যাগ করেছেন কীভাবে! তাই তো তারা হয়েছেন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ। আমরা আছি পিছিয়ে। বসে রইলাম হাত গুটিয়ে। আমরা আশা করি, তুমি আমাদের জন্য রবের অসন্তুষ্টির কারণ হবে না। বরং সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

শোনো রুফায়দা! এটা শেষ যামানা। চতুর্দিকে ফেতনা। এই ফেতনায় মেয়েরাই অগ্রগামী। তারাই সংখ্যায় বেশি জাহান্নামী। প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদীছে তাই বলেছেন। তারা পোশাক পরেও উলঙ্গ। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এমন নারীদের মতো হবে না। বরং তুমি তাদের সংশোধনে কাজ করবে। তাদের সঠিক পথ দেখাবে। তুমি স্রোতের বিপরীতে চলবে। তাদের সাথে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে বেড়াবে না। তুমি আলেম-আলেমার সন্তান। অন্যদের মতো চলাটা তোমার জন্য শোভা পায় না। তুমি তো ছোট থেকেই বোরকা-হিজাব পরিধান করবে। ছালাত ও তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হবে। আল-কুরআন হিফয করবে। বাবা-মায়ের চক্ষু শীতল করবে।

রুফায়দা! আম্মু! তোমার সুস্থতার জন্য দু'আ করি। বাচ্চারা সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তোমাকে অনেক ভালো রেখেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। তোমার আম্মুকে বলবে, ছোট থেকেই তোমাকে ঈমান শেখাতে। কারণ ঈমানই সবার আগে। তোমাকে আদব-আখলাক্ব সবই শেখাবে তোমার আম্মুই। বাবা হয়তো কর্মব্যস্ততার কারণে তোমাকে সময় দিতে পারবে না। তাই, তুমি তোমার আম্মুকে মেনে চলবে। তার কথামতো কাজ করবে। তোমার আম্মুই তোমার শিক্ষিকা।

তোমাকে নিয়ে মহান আল্লাহর সমীপে হৃদয়ের কিছু আকুতি পেশ করলাম মাত্র। আল্লাহ তাআলা আমাদের নিরাশ করবেন না, ইনশা-আল্লাহ।

* অধ্যয়নরত, কামিল, সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।

ঈদ

-আব্দুল বারী
গজারিয়াপাড়া, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।

ঈদ মানে শুধু আনন্দ আর নয় খুশি,
ঐ আকাশে নব মাসের বাঁকা চাঁদের হাসি।
ঈদ মানে হই-হুল্লোড় নয় চাঁদ দেখা,
এর থেকে মানবজাতির আছে অনেক শেখা।
ঈদ মানে হিংসা-বিভেদ নয় কোনো রাগ,
হাসি-খুশি আনন্দ মোরা করব সবাই ভাগ।
ঈদ মানে দুঃখ-ব্যথা সব ভুলে যাওয়া,
সুখে-দুখে সর্বজনে পাশাপাশি পাওয়া।
ঈদ মানে সবাই সমান, উঁচু নিচু নয়,
একথা স্মরণ যেন সারা জনম রয়।
ঈদ যেন না হয় কভু শুধু নিজের জন্য,
সৎ কর্মে সহযোগী হয়ে হব মোরা ধন্য।

হব জান্নাতের পাখি

-সাব্বির আহমাদ
শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার,
বংশাল, ঢাকা।

এ ধমনির বুক চিরে অভিষেক মোর
অভীষ্ট কয়েক উপলক্ষ্য নিয়ে,
চাই ইলাহী আলোয় উদ্ভাসিত হতে আর
সুন্নাহর সোনারাঙা রোদে হৃদয়টা বিধৌত করতে।
মনের পলিদ্বীপে ঘটাবো পুন্যের ফলন
নিষুপ্ত তমায় বিনিদ্রে করব পাপের দ্রবণ।
প্রভুর আরাধনায় থাকব সদা প্রমত্ত
রাসূলের আদর্শ গায়ে মেখে হব আমি ঋদ্ধ।
কষ্টেরা যবে বুকের মাঝে প্রহার করবে খুবি
রবের পানে করদ্বয় তুলে খুঁজব প্রশান্তির চাবি।
মন-পিঞ্জরে পূঞ্জীভূত আছে যত আর্তি
তা নিয়ে তাহাজ্জুদে লিখব একটি চিঠি।
এভাবেই ধীরে ধীরে জমাবো নেকের ঢিপি
ওপারে যাত্রাকালে হবে তারা সাথি।
প্রভু! এ নচ্ছারকে দাও একটুখানি শক্তি
যেন পেরোতে পারি সেই বৈতরণি,
তোমার অপার করুণার বলে
হতে পারি জান্নাতের পাখি।

মৃত্যু কাণ্ডারি

-লিমানা আনজুমান লিমা
বিরল, দিনাজপুর।

উষার আলোয় ডেকেছে আমায়
যেতে হবে বহুদূর,
মনের ভেতর কালেমার ধ্বনি
বাজিতেছে সুমধুর।
মৃত্যু কাণ্ডারি, অধম আমি
দাওনা গো মুখে বারি,
শত সোহাগে ভরা এ পরাণ
চির-সুখেরই কাণ্ডারি।
এপারে থেকে চেয়েছি ওপার
দিওগো প্রভু মোরে,
চিরসুখী জান্নাত চাই যে আমি
শুধু যে তোমারই তরে।
বিশ্বরবের দরবারে মোর
প্রেমময় আবদার,
আঁখিজলে ডুবি, তোমাকেই খুঁজি
চাই শুধু রহমানের দীদার।
মৃত্যু দুয়ারে পতিত হয়ে,
তব কাছে মোর একটাই যিকরুল্লাহ
ক্ষণকালে মোর ইতিবাক্য যেন হয়,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ঈমান

-মিরাজুর রহমান তাহমিদ
মাইজদী, নোয়াখালী।

ঈমান হলো কথা কাজে নয় শুধু বিশ্বাসে,
এই কথাটা মনে রেখো প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
ঈমানটা তো বাড়ে কমে ঈমান ভঙ্গ হয়,
না বাড়ালে ঈমান কমে এটা সব সময়।
ঈমান ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হীনদেরও হীন,
ঈমান ছাড়া তুমি হবে সবচেয়ে ক্ষীণ।
মুখে স্বীকার, ক্বলবে ইয়াক্বীন কাজে হবে প্রকাশ,
এ সব কিছু হলে ঈমান নইলে ঈমান যে নাশ।
কথা ও কাজ, মন ও মুখের অঙ্গের শুধু কাজ,
এ পাঁচভাবে রবের জন্যে ইবাদত শুরু আজ।
ঈমান ছাড়া আমল হলো আস্ত মরা দেহ,
তাই ঈমান যে শিখতে হবে পার পাবে না কেহ।

বাংলাদেশ সংবাদ

করোনার চেয়ে প্রতিবছর ৫ গুণ বেশি মৃত্যু হয় তামাকে!

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে ৩০ হাজারের মতো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে বছরে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। যা করোনায় মৃত্যুর চেয়েও ৫ গুণ বেশি। এমনকি প্রতিদিন গড়ে তামাক ব্যবহারের চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রাণ হারাচ্ছেন ৪৫০ জন মানুষ। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে আমাদের দেশে অসংক্রামক রোগ যেমন— হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ও শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি রোগ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশই অসংক্রামক রোগের কারণে ঘটছে। আর এই অসংক্রামক রোগ সৃষ্টির কারণ মূলত ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার। দেশে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। কর্মক্ষেত্রসহ পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন ৩ কোটি ৮৪ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। আর তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। তামাক ব্যবহারের দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। এর কারণ বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা নির্মিত করার ক্ষেত্রে এখনও সর্বোত্তম মান অর্জন করতে পারেনি। তামাকে শুধু যে ফুসফুসে ক্যান্সার হয়, তা নয়। এছাড়াও শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে সুপারি, গুল, জর্দাসহ ধোঁয়াবিহীন যেসব তামাক রয়েছে সেগুলোর কারণে জিহ্বা, ঠোঁটের ক্যান্সার হয়।

ভোলায় নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার

দেশে চরম গ্যাস সংকটের মধ্যে সুখবর নিয়ে এল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (BAPEX)। দেশে নতুন একটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস অনুসন্ধান সংস্থাটি। ভোলার ইলিশা-১ কূপটি দেশের নতুন গ্যাসক্ষেত্র। এটি দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র আর ভোলা জেলার তৃতীয় গ্যাসক্ষেত্র। নতুন গ্যাসক্ষেত্রটিতে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুত রয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এই গ্যাসের বাজারমূল্য ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর যদি আমদানি করা এলএনজির দর বিবেচনা করা হয়, তাহলে মূল্য দাঁড়াবে ২৬ হাজার কোটি টাকা। আর ভোলায় সব মিলিয়ে প্রায় ৩ টিসিএফ গ্যাস মজুত আছে বলে আশা করা হচ্ছে। নদীর ঠিক ওপরের দিকে নতুন গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করা হয়েছে। ২৬ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত এখান থেকে গ্যাস পাওয়া যাবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

এক মাদরাসা থেকেই ১০ লাখ হাফেয

পাকিস্তানের একটি মাদরাসা থেকে পবিত্র কুরআনের হাফেয হয়েছেন অন্তত ১০ লাখ শিক্ষার্থী। ওয়াকাফ উল মাদারিস নামের মাদরাসাটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে এই মাদরাসা থেকে ১০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী সফলভাবে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছেন। তার মধ্যে শুধু ২০১৯ সালে মাদরাসাটি থেকে ১৪ হাজার ছাত্রীসহ ৭৮ হাজার জন পবিত্র কুরআনের হাফেয হন। মাদরাসাটি চার বছরের কম বয়সী শিশুদের ভর্তি করে। তারা মাত্র দুই বছরের মধ্যে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে। কুরআন মুখস্থ ছাড়াও এই পাকিস্তানী মাদরাসার ছাত্ররা ইংরেজি, উর্দু, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান স্টাডিজ এবং বিজ্ঞান। আরবী পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা না হলেও সঊদী আরবের তুলনায় পাকিস্তানের মানুষ বেশি কুরআন মুখস্থ করছে। সঊদী আরবে প্রতি বছর মাত্র ৫ হাজার শিক্ষার্থী কুরআনের হাফেয হয়। মাদরাসাটি সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং পুরস্কৃত হয়েছে।

বিশ্বে প্রতিদিন ক্ষুধা নিয়ে ঘুমান প্রায় ৮৩ কোটি মানুষ

বিশ্বজুড়ে ক্ষুধার মাত্রা বাড়ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর তথ্য অনুসারে, ৮২৮ মিলিয়ন মানুষ বা বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রতি রাতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায়, যা আগের বছরের তুলনায় ৪৬ মিলিয়ন বেশি। এফএও-এর তথ্যানুসারে, অনাহারে থেকে ঘুমাতে যাওয়া মানুষের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নারী। তাদের শতকরা ৮০ ভাগ জলবায়ু পরিবর্তনপ্রবণ এলাকায় বসবাস করেন। শরীর পর্যাপ্ত খাদ্য থেকে লম্বা সময়ের জন্য বঞ্চিত হলে তাকে ক্ষুধা হিসেবে ধরা হয়। দীর্ঘ সময়ের এই অবস্থায় স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক দশক ধরে এই ক্ষুধা বা

খাদ্যাভাব কমে এসেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা আবার বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এফএও-এর তথ্য বলছে, ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা ১৫ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্য দায়ী যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক আঘাত ও করোনা মহামারি। এশিয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের বসবাস। এই মহাদেশে ২০২১ সালে ৪২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ অনাহারে কাটিয়েছেন। তবে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আফ্রিকায়, ওই বছর তাদের সংখ্যা ২৭ কোটি ৮০ লাখ। যেসব মানুষ খাদ্যের মারাত্মক সংকটে ভুগছেন, তাদের জীবন ও জীবিকা অত্যাসন্ন বিপদের মুখে পড়েছে। ২০২২ সালে চতুর্থ বছরের মতো তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস অনুযায়ী, এমন মারাত্মক ক্ষুধার মুখে আছেন ২৫ কোটি ৮০ লাখ মানুষ।

মুসলিম বিশ্ব

গাজায় ইসরাঈলী আগ্রাসনে নিহত ৩৩ মুসলিম, আহত ১৯০

ফিলিস্তীনের অবরুদ্ধ গাজায় ৫ দিন ধরে চলা ইসরাঈলী বাহিনীর বর্বরোচিত বিমান হামলা মিশরের মধ্যস্থতায় শেষ হয়েছে। ইয়াহূদীদের এমন আগ্রাসী হামলা সত্ত্বেও নীরব ভূমিকা পালন করেছে আরব ও অনারব মুসলিম দেশসমূহ। ফিলিস্তীনী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরাঈলী বাহিনীর এবারের আগ্রাসনে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩৩ ফিলিস্তীনী। এদের মধ্যে ৭ জন ফিলিস্তীনী স্বাধীনতাকামী সংগঠন ইসলামিক জিহাদের নেতা, বাকি সবাই বেসামরিক মুসলিম। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ৬ শিশু ও ৩ জন নারী। এসব হামলায় অন্তত ১৯০ জন মুসলিম আহত হওয়ার পাশাপাশি ধ্বংস হয়েছে ফিলিস্তীনীদের কমপক্ষে ১০৫০টি বাড়ি। ইসরাঈলের এমন আগ্রাসনের জবাবে ফিলিস্তীনী প্রতিরোধ আন্দোলন ইসলামিক জিহাদ (PIJ) ও হামাস পাল্টা রকেট হামলা চালিয়েছে। শত শত রকেট হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসরাঈলের রাজধানী তেল আবিবসহ বেশ কিছু এলাকা। পাশাপাশি নিহত হয়েছে ২ জন এবং আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন ইয়াহূদী। এই রকেট হামলার ফলে গাজা শহরের নিকটবর্তী বসবাসকারী অন্তত ১২ হাজার ইয়াহূদী ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। এছাড়াও এসব রকেট হামলায় ইসরাঈলের একটি জ্বালানি কোম্পানির পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। এমনকি হামলার জেরে বন্ধ করে দেয়া হয় ইসরাঈলের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বেন গুরিওন। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মিশরের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতিতে পৌঁছায় ইসরাঈল। ফিলিস্তীনী স্বাধীনতাকামী দলগুলো নিজেদের সাধ্যমতো তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণেই যুদ্ধ বিরতিতে যেতে বাধ্য হয় ইসরাঈল। শুধু এই চলতি বছরেই এখন পর্যন্ত প্রায় ছয় মাসে দুই শতাধিক ফিলিস্তীনী মুসলিমকে খুন করেছে ইয়াহূদীরা। পাশাপাশি লাঞ্ছিত হয়েছে অসংখ্য মুসলিম নারী এবং ইয়াতীম হয়েছে অসংখ্য মুসলিম শিশু।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের প্রথম স্মার্ট জায়নামায ‘সাজদাহ’

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪৮তম আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন প্রদর্শনী। সেখানে বিশ্বের প্রথম স্মার্ট জায়নামায তৈরি করে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন কাতারের এক প্রকৌশলী। স্মার্ট এই জায়নামাযের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সাজদাহ’। এটি দেখতে সাধারণ জায়নামাযের মতোই। তবে এতে রয়েছে লাইট ও স্পিকারসহ ছোট একটি স্ক্রিন, যাতে ইংরেজি ও আরবী ভাষায় ২৫টিরও বেশি প্রার্থনার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়। ছালাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে কিছুটা উঁচু করে এ স্ক্রিন স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। জায়নামাযটির নির্মাতা আব্দুর রহমান ছালেহ খামিস বলেন, এটি মূলত নওমুসলিমদের উপকারের উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে। নতুনভাবে ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যক্তিরা প্রায় সময়েই ছালাতের ধরন, আয়াত ও দু‘আগুলো নিয়ে অসুবিধার মুখে পড়ে যান। সেক্ষেত্রে সাজদাহ তাদের জন্য বেশ সহায়ক বিবেচিত হতে পারে। তারাবীহ, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ছালাতের সময় জায়নামাযটির এলইডি স্ক্রিন থেকে কুরআন পড়ার মাধ্যমে মুসলিমরা সঠিকভাবে তাদের ছালাত আদায় করতে পারবেন। সাজদাহ নামের এই জায়নামায মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এমনকি এটিকে নিজেদের সুবিধামতো কাস্টমাইজও করা সম্ভব।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : ঘুমের সময় কি শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যায়?

-খায়রুল ইসলাম

উত্তর : হ্যাঁ, ঘুমের সময় শরীর থেকে রূহ বের হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ গ্রহণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও গ্রহণ করেন ঘুমের সময়। তারপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে’ (আয-যুমার, ৩৯/৪২)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ‘তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদেরকে তিনি আবার জীবিত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন’ (আল-আনআম, ৬/৬০)। এক সফরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম সকলেই ঘুম থেকে জাগতে পারেননি। সূর্যের তাপ গায়ে লাগার পর সবার ঘুম ভাঙ্গে। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা মৃত ছিলে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিকট তোমাদের রূহকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত আদায় না করেই ঘুমিয়ে যাবে, যে যখন জাগ্রত হবে তখনই আদায় করে নিবে। অথবা যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করতে ভুলে যাবে, তার যখনই স্মরণ হবে, তখন তা আদায় করে’ (মুসনাদে আবূ ইয়ালা, ১/৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩৯৬)। তবে কীভাবে রূহ বের হয়, সে বিষয়ে কোনো বিবরণ আসেনি। ইবনু রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃত্যুর সময় রূহ বের হওয়া এবং ঘুমের সময় রূহ বের হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিপূর্ণভাবে রূহ বের হয়ে যায় আর ঘুমের সময় অসম্পূর্ণভাবে রূহ বের হয় যার ফলশ্রুতিতে শরীরের সাথে তার একটা সম্পর্ক থেকে যায় (ফতহুল বারী, ৩/৩২৬)। আমরা বলতে পারি ঘুম হচ্ছে অর্ধেক মৃত্যু। আমাদের ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঘুমের সময় আল্লাহ রূহ গ্রহণ করেন’- আমরা সেটাকে সেভাবেই বিশ্বাস করি। এর ধরন-পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি না।

শিরক

প্রশ্ন (২) : স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফাউন্ডেশন, সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করে তা শরীআতের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

-আব্দুস সুবহান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ‘জয়ন্তী’ শব্দটি ইংরেজী Jubilee এর বাংলা। শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ Bubile এর অপভ্রংশ থেকে। অবশ্য এর আদি ল্যাটিন শব্দ Jubilaeus। মূলত কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির যথাক্রমে সূত্রপাত ও জন্মকে ঘিরে সুনির্দিষ্ট সময়কাল পূরণ হওয়া উপলক্ষে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক স্মৃতিচারণের আনন্দঘন অনুষ্ঠান। আরবীতে اليوبيل বলা হয়। শায়খ বকর আবূ যায়েদ বলেন, শব্দটি ইয়াহূদীদের নিজস্ব শব্দ (মু‘জামুল মানাহী আল লাফযিয়্যাহ, পৃ. ৫৭৮)। তাই এসব অনুষ্ঠান ইসলামী শরীআতে অনুমোদিত নয়। বরং এগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি, যেগুলো অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরেই অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)।

প্রশ্ন (৩) : কবর পাকা করে তার দেয়ালে মৃত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা লেখা যাবে কি?

-জুয়েল রানা
রাজশাহী।

উত্তর : কবর পাকা ও চুনকাম করা, সমাধি সৌধ নির্মাণ করা, গায়ে নাম-ঠিকানা লেখা, কবরের উপরে বসা, কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা সবই নিষিদ্ধ। জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কবর পাকা করতে, তার উপর কোনো কিছু লিখতে বা কিছু নির্মাণ করতে এবং তা পদদলিত করতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৬৯-৯৭২; তিরমিযী, হা/১০৫২)।

তবে পাথর বা কোনো কিছু দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা যায়। আল মুত্তালিব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উছমান ইবনু মাযঊন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মারা গেলে তার লাশ আনা হলো, তারপর লাশ দাফন করা হলো। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে একটি পাথর নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লোকটি তা বহন করতে অক্ষম হলো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার আস্তিন গোটালেন। বর্ণনাকারী কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল মুত্তালিব বললেন, আমাকে যে ব্যক্তি এ ঘটনা অবহিত করেছেন তিনি বললেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি যখন তিনি তাঁর জামার আস্তিন গুটিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি পাথরটি দুই হাতে তুলে এনে (উছমান ইবনু মাযঊনের) শিয়রে রাখেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার কাছে দাফন করব' (আবূ দাঊদ, হা/৩২০৬)।

বিদআত

প্রশ্ন (৪) : অনেকেই ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে বুকে ফুক দেয়। এটি কি শরীয়তসম্মত?

-তৈমুর রহমান
গাজীপুর।

উত্তর : ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া শেষে বুকে ফুঁক দেওয়া শরীআতসম্মত নয়। এর পক্ষে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। তবে ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছু জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না' (নাসাঈ, আল-কুবরা, হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯৭২)। তবে ঘুমানোর পূর্বে নাস, ফালাক ও ইখলাস পড়ে হাতে হালকা থুথু করে সমগ্র শরীরে মাসাহ করা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ (ছহীহ বুখারী, হা/৫০১৭)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৫) : পেশাব-পায়খানা শেষে অযূ করা কি বাধ্যতামূলক?

-আব্দুর রহমান
দিনাজপুর।

উত্তর : না, পেশাব-পায়খানা শেষে অযূ করা ব্যধ্যতামূলক নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি যখন পেশাব করব, তখনই অযূ করার জন্য আদিষ্ট হয়নি। যদি আমি সর্বদা এরূপ করি, তাহলে তা সুন্নাত হয়ে যাবে' (ছহীহুল জামে', হা/৫৫৫১)। তবে অযূ করা ভালো। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি তাঁর জন্য ছোট পাত্রে অথবা চামড়ার পাত্র ভরে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি ইস্তেঞ্জা করতেন, অতঃপর মাটিতে তাঁর নিজ হাত মুছতেন। অতঃপর আমি আরেক পাত্র পানি নিয়ে আসতাম, তিনি তা দ্বারা অযূ করতেন (আবূ দাঊদ, হা/৪৫)।

প্রশ্ন (৬) : আমার জানা মতে, হাদীছে গোবর ও হাড় দিয়ে কুলুখ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই কথা কি সঠিক? আর যদি সঠিক হয়, তাহলে এই নিষেধাজ্ঞার পিছনে হিকমত কী?

-সোহলে রানা
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : হ্যাঁ, গোবর ও হাড় দিয়ে কুলুখ করা নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর এটি নিষেধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, এগুলো জিনদের খাবার। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা শুকনা গোবর ও হাড় দিয়ে শৌচকর্ম করো না। কেননা এসব তোমাদের ভাই জিনদের খোরাক' (তিরমিযী, হা/১৮; ছহীহুল জামে, হা/৭৩২৫)। অন্য বর্ণনাতে আছে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদল জিনদেরকে বলেছিলেন, 'যে জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে তার হাড় তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হাতের স্পর্শে তা পুনরায় মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। উটের বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাদ্য' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫০)।

প্রশ্ন (৭) : বিড়ালের স্পর্শ করা পানি দিয়ে কি অযূ করা যাবে?

-রফিকুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তাই রুচি হলে তা খাওয়া, পান করা এবং অযূ করাও যায়। কাবশা বিনতে কা'ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) (তার শ্বশুর) আসলে আমি তাকে অযূর পানি এগিয়ে দিলাম। একটি বিড়াল এসে সেই পানি পান করতে লাগল। তখন তিনি পাত্রটি তার দিকে কাত করে ধরলেন, যেন ভালোভাবে পান করতে পারে। কাবশা বলেন, তিনি আমাকে তার দিকে তাকাতে দেখে বললেন, তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বিড়াল নাপাক নয়। সে তোমাদের মাঝে ঘোরাফেরা করা একটি প্রাণী' (আবূ দাঊদ, হা/৭৫)।

প্রশ্ন (৮) : কীভাবে একজন মহিলা বুঝতে পারবে যে, সে হায়েয থেকে পবিত্র হয়েছে?

-মনোয়ারা বেগম
রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণত হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, যা দেখলেই বুঝা যায়। সেই রক্ত বন্ধ হলে এবং সাদা তরল পদার্থ বের হওয়া শুরু হলে বুঝতে হবে যে, সে হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। কেননা মহিলা ছাহাবীগণ আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট তুলা প্রেরণ করতেন। তাতে হলুদ রং দেখলে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলতেন, তোমরা সাদা তরল পদার্থ দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করো না। এ দ্বারা তিনি হায়েয হতে পবিত্র হওয়া বুঝাতেন (ছহীহ বুখারী, ১/৭১)।

ছালাত

প্রশ্ন (৯) : ছালাতে সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে একটা সিজদা হয়েছে, নাকি দুইটি সিজদা হয়েছে। এরূপ সন্দেহ হলে করণীয় কী?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতে সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে পরের রাকআতের কিরাআত শুরু করার আগেই যদি সন্দেহ হয়, তাহলে সিজদার নিশ্চিত সংখ্যার ওপর নির্ভর করে, আরেকটি সিজদা দিবে। রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন রাকআত আদায় করা হলো না চার রাকাআত আদায় করা হলো- ছালাতের মধ্যে তোমাদের কারো এরূপ সন্দেহ হলে সে যে কয় রাকআত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে (তিন রাকাআত) সে কয় রাকআতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। এরপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে। (এখন) সে যদি পাঁচ রাকআত আদায় করে থাকে তাহলে এ দুই সিজদা দ্বারা তার ছালাতের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তার ছালাত চার রাকআত হয়ে থাকে তাহলে (এই) সিজদা দুটি শয়তানকে লাঞ্ছিত বা অপদস্থ করার শামিল হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭১)। আর যদি পরের রাকআতের কিরাআত শুরু করে দেয়, তাহলে শেষে পুরো এক রাকআত আদায় করে সাহু সিজদা করবে (শারহুল মুমতে, ৩/৩৮৪)।

প্রশ্ন (১০) : কোনো ব্যক্তি যদি ঈদের ছালাতের শেষ বৈঠক পায়, তাহলে সে কীভাবে ছালাত আদায় করবে?

-নাজমুল হুদা
পাবনা।

উত্তর : যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের শুধু বৈঠক পাবে, সে ইমামের সালাম ফিরানোর পরে দুই রাকআত ছালাত আদায় করে নিবে। তাতে সে ইমামের মতোই তাকবীর, কিরাআত ও রুকূ-সিজদা করবে (ফাতওয়া আল লাজনাহ আদ দায়েমাহ, ৮/৩০৭)।

প্রশ্ন (১১) : আমল কবুল হবার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে?

-মেহেদী হাসান
বাগেরহাট।

উত্তর : আল্লাহর নিকটে আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো- ১. ইখলাছ থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন' (আল-বায়্যিনাহ, ৯৮/৫)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'যে কেউ দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমরা তাদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করেছিল আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে। আর তারা যা করত তা ছিল নিরর্থক' (হূদ, ১১/১৫-১৬)। ২. রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে আমলটি করা। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি এমন আমল করে, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (১২) : আমার প্রশ্ন হলো মহিলারা মাসিক অবস্থায় কীভাবে ছালাত আদায় করবে?

-জহুরুল ইসালাম
গাজীপুর।

উত্তর : মাসিক অবস্থায় মহিলাদের জন্য ছালাত, ছিয়াম আদায় করা জায়েয নয়। মাসিক অবস্থায় ছালাত, ছিয়াম আদায় করলেও তা সঠিক হবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমাদেরকে ছিয়াম কাযা করার আদেশ করা হতো, কিন্তু ছালাত কাযা করার আদেশ করা হতো না (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫)। এই হাদীছটি প্রমাণ করে যে, মহিলা ছাহাবীগণ হায়েয চলাকালে ছালাত ও ছিয়াম পালন করতেন না। সুতরাং মহিলারা তাদের হায়েয শুরু হলে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবেন।

প্রশ্ন (১৩) : শুক্রবার ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর কি ফরজ ব্যতীত নফল ছালাত আদায় করা যাবে?

-সাব্বির রহমান
সিরাজগঞ্জ ।

উত্তর : শুক্রবারসহ যে কোনো দিনেই ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছালাত আদায় করার পরে অন্য নফল ছালাত আদায় করার ব্যাপারে ছহীহ কোনো দলীল নেই। সুতরাং এমন আমল করা যাবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তাহলে সেটি বর্জনীয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (১৪) : জনৈক আলেম অযূ করার পরে দুই রাকাআত ছালাত আদায় করার কথা বলেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, অযূ করার পরে দুই রাকআত ছালাত আদায়ের বিশেষ কোনো ফযীলত আছে কি?

-এমদাদুল হক
খুলনা।

উত্তর : হ্যাঁ, অযূ করার পরে দুই রাকআত ছালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অযূর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পরে বললেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এমনভাবে অযূ করতে দেখেছি। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মতো এ রকম অযূ করবে, অতঃপর দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে, যাতে নিজে নিজে কোনো

কথা বলবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬)।

প্রশ্ন (১৫) : মহিলাদের ইক্বামত দিয়ে ছালাত পড়তে হবে কি?

-আব্দুল কাইয়্যুম
সৈয়দপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ, সেভাবেই ছালাত আদায় করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১)। তাই মহিলাদেরকে ইক্বামত দিয়েই ছালাত আদায় করতে হবে। হাফছা রাযিয়াল্লা-হু আনহা যখন ছালাত আদায় করতেন তখন ইক্বামত দিতেন (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৩৩৮)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি আযান দিতেন, ইক্বামত দিতেন এবং মহিলাদের ইমামতি করতেন। এ সময় তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন (সুনানুল কুবরা, হা/৫১৩৯)।

প্রশ্ন (১৬) : ফসল কাটার মৌসুমে কৃষকেরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করে। এমতাবস্থায় তারা ছালাত ক্বছর করতে পারে কি?

-ফয়সাল মাহমূদ
দিনাজপুর।

উত্তর : যদি সফরের দূরত্বে কাজ করতে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তারা ছালাত ক্বছর করতে পারবে। কেননা সফরের জন্য কোনো কর্ম নির্ধারণ নেই। যেকোনো প্রয়োজনে মানুষ সফরে বের হলে ছালাত ক্বছর করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ক্বছর করার কোনো দোষ নেই' (আন-নিসা, ৪/১০১)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলতেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে মদীনায় যোহরের ছালাত চার রাকআত পড়েছি। আর যুল হুলাইফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই রাকআত পড়েছি (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৯০)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটানা ১৯ দিন ক্বছর করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৪০০, ১০৮১)। অর্থাৎ যতদিন তিনি অবস্থান করেছেন ততদিন কছর করেছেন, তাই স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করে পড়া যাবে।

প্রশ্ন (১৭) : বাড়িতে সুন্নাত ও নফল ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই?

-শফিকুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ফরয ছালাত ছাড়া অন্যান্য সুন্নাত ও নফল ছালাতসমূহ বাড়িতে আদায় করাই বেশি উত্তম। আর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও এই ছালাতগুলো বাড়িতেই আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু ছালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না' (ছহীহ বুখারী, হা/১১৮৭)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, তখন সে যেন ঘরের জন্য ছালাতের কিছু অংশ রেখে দেয়। কেননা ঘরে ছালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তাতে কল্যাণ দান করেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৩৭৬)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'বাড়িতে ছালাত আদায় করাকে তোমরা নিজেদের অভ্যাস বানিয়ে নাও। কেননা পুরুষের জন্য ফরয ছালাত ব্যতীত ঘরে ছলাত আদায় করা উত্তম' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮১)। সুতরাং ফরয ছালাত ছাড়া সুন্নাত ও নফল ছালাতগুলো বাড়িতেই আদায় করার চেষ্টা করতে হবে।

যাকাত

প্রশ্ন (১৮) : যদি কোনো ব্যক্তি কাজের বিনিময়ে মজুরি হিসেবে ২০ মণ বা তার অধিক ধান পায় তাহলে তাকে ওশর দিতে হবে কি-না? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই?

-মো. দুলাল
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : না, এমন ব্যক্তিকে ওশর দিতে হবে না। কেননা ফসলের যাকাত ফরয হয় ফসল উৎপাদনকারীর ওপর,

শ্রমিকের ওপর নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর ফসল তোলার দিনে তোমরা সেগুলোর হক্ব (যাকাত) দিয়ে দাও’ (আল-আনআম, ৬/১৪১)। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু পরিশ্রম করে ফসল পেয়েছে, নিজে উৎপাদন করেনি, তাই তাকে এগুলোর যাকাত দিতে হবে না।

প্রশ্ন (১৯) : আমি কাঠের কাজ করি। দুই চার জন শ্রমিক নিয়ে মাসিক গড়ে দশ হাজার টাকা লাভ হয়। এই টাকাগুলো আমার পরিবারের পেছনেই খরচ হয়ে যায়, কোনো টাকা জমা থাকে না। আমার প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমাকে কি যাকাত দিতে হবে?

-নূর ইসলাম
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : না, এমতাবস্থায় যাকাত দিতে হবে না। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত হলো নিছাব পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য সমপরিমাণ সম্পদ থাকা। যার কাছে নিছাব পরিমাণ সম্পদ আছে একমাত্র তার ওপরই যাকাত ফরয (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯)। তাছাড়া যাকাত ফরয হওয়ার জন্য উক্ত সম্পদ এক বছর যাবৎ জমা থাকতে হবে (ইবনু মাজাহ, হা/১৭৯২)। সুতরাং যেহেতু পরিবারের পেছনে খরচ করার পরে আপনার নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না, তাই আপনাকে যাকাত দিতে হবে না।

ছিয়াম

প্রশ্ন (২০) : মুহাররমের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম পালন করলে ৫০ বছরের নফল ছিয়ামের নেকী লেখা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-নাজমুল হক
ফরিদপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে শুধু ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করার ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আর আশূরার দিনের ছওমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা হলো, আল্লাহ এর দ্বারা আগের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০৩)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘রামাযান মাসের ছিয়ামের পরে উত্তম ছিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররম মাসের আশূরার ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হলো রাতের ছালাত’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩)।

প্রশ্ন (২১) : আশূরা উপলক্ষে করণীয় কী?

-সাদেকুর রহমান
ঢাকা।

উত্তর : আশূরা উপলক্ষে করণীয় হলো, এদিন ও তার পূর্বে একদিনসহ মোট দুইদিন ছিয়াম পালন করা। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন ছিয়াম রেখেছেন; আর ছাহাবীগণকেও রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এদিন তো ঐদিন, যেটি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ! (আর যেহেতু ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের আমরা বিরোধিতা করি, তাই আমরা ছিয়াম রেখে তো এ দিনের গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যদি আমি আগামী বছর জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই নয় তারিখেও ছিয়াম রাখব’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪)।

বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (২২) : অনেক সময় উপযুক্ত পাত্র বিবাহের প্রস্তাব দিলে মেয়ে অথবা মেয়ের পিতা এই বলে রদ করে দেয় যে, পড়ালেখা শেষ হলে বিয়ে হবে। এটা কি বৈধ?

-কামরুল হাসান
ঢাকা।

উত্তর : এটা বৈধ নয়। পড়ালেখা কোনো ওযর নয়। তাছাড়া বিয়ের পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া যায়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কাছে এমন কারো বিবাহের প্রস্তাব আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তা না কর, তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি

হবে' (তিরমিযী হা/১০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৬৭)।

প্রশ্ন (২৩) : কোনো মুসলিম মহিলা হিন্দু বা কোনো বিধর্মীকে বিবাহ করতে পারে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা।

উত্তর : কোনো মুসলিম মহিলা হিন্দু কিংবা কোনো বিধর্মীকে বিবাহ করতে পারে না। তার জন্য বিয়ে করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা নারীকে ব্যতীত বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কেউ বিয়ে করে না, মুমিনদের জন্য এটা হারাম করা হয়েছে' (আন-নূর, ২৪/৩)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 'মুহাজির মহিলাদের সম্পর্কে যাচাই পরীক্ষার পর তোমরা যদি জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। মুমিন নারীগণ কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়' (আল-মুমতাহিনা, ৬০/১০)। তিনি আরো বলেন, 'ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না। মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মুমিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন' (আল-বাক্বারা, ২/২২১)।

প্রশ্ন (২৪) : বিয়ে পড়ানোর পর স্বামী-স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী কি মোহর পাওয়ার অধিকার রাখে?

-ইমরান আলী
বগুড়া।

উত্তর : মোহর বাঁধা হলে অর্ধেক মোহর পাবে। বাঁধা না হলে কিছু খরচপত্র পাবে। আর তার কোনো ইদ্দত নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করা কিংবা মোহর নির্ধারণের পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও। তাদেরকে কিছু খরচ দিয়ে দাও। সচ্ছলরা সচ্ছলতা অনুসারে দিবে, আর অসচ্ছলরা তাদের সাধ্যানুযায়ী দিবে। ন্যায়সংগতভাবে খরচ দেওয়া সৎকর্মশীলদের জন্য কর্তব্য। আর যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন, সে যদি মাফ করে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। অবশ্য তোমাদের মাফ করে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতির (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা' (আল-বাক্বারা, ২/২৩৭)। আল্লাহ আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীদের বিবাহ করার পর তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের কোনো পালনীয় ইদ্দত নেই। সুতরাং তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী প্রদান করো এবং সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় করো' (আল-আহযাব, ৩৩/৪৯)।

প্রশ্ন (২৫) : ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান মেয়েদের বিয়ে করা যাবে কি? আর যেসব ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান বা আহলে-কিতাবদের কথা কুরআনে বলা হয়েছে তারা কি বর্তমান ইয়াহূদী, খ্রিষ্টানদের মতো?

-সোহানুর রহমান
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলিম পুরুষের উচিত হলো, দ্বীনদার মুসলিমা নারীকে বিবাহ করা। তবে যদি ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের মেয়েরা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হয়, নাস্তিক না হয়, আর যদি সচ্চরিত্রা হয়, তাহলে এমন মেয়েকে বিবাহ করাও জায়েয। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণকারী হিসেবে নয়' (আল-মায়েদা, ৫/৫)। এই বিধানে সেই যুগের আর বর্তমান যুগের

আহলে কিতাবের মেয়েদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে শর্ত হলো, সেই মেয়েদেরকে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং সচ্চরিত্রবান হতে হবে (তাফসীরুল মানার, ৬/১৪৯)। উল্লেখ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান যুগের বেশিরভাগ ইয়াহূদী খ্রিষ্টান নাস্তিক অথবা মুশরিক। সচ্চরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। এছাড়া বেশিরভাগ অমুসলিম দেশে সন্তান-সন্ততির উপর পিতার কোনো হক্ব থাকে না। ফলত, তাদেরকে বিবাহ করা অর্থ হচ্ছে অমুসলিম সন্তান জন্ম দেওয়া। তাই বর্তমান ফিতনার যুগে বেচে থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন (২৬) : নিজের বোনের মেয়ের মেয়েকে বিয়ে করা যাবে কি?

-ওয়াহিদুল ইসলাম
পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তর : না, নিজের বোনের মেয়ের মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না। কারণ সে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত (আন-নিসা, ৪/২৩)। তাছাড়া বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন, তাদের কন্যা এবং এ ধারাগুলি যত নিম্নের হোক না কেন তাদের বিয়ে করা হারাম (ফৎহুল ক্বাদীর, ১/৪৪৫)।

প্রশ্ন (২৭) : যে ব্যক্তি স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট রাখে এবং তার স্ত্রীর হক্ব আদায় করে না। এক্ষেত্রে ইসলামের দিক নির্দেশনা কী?

-মুশফিকুর রহমান
পাবনা।

উত্তর : শরীআতের বিধান হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো’ (আন-নিসা, ৪/১৯)। মুআবিয়া ইবনু হাইদাহ বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি যা খাবে তাকে তা খাওয়াবে। তুমি যে মানের কাপড় পরিধান করবে তাকেও সে মানের কাপড় পরিধান করাবে। তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। তাকে একাকী বাড়ীর বাইরে যেতে দিবে না (আবূ দাঊদ, হা/২১৪২)। আর অত্যাচার করার কারণে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য অন্ধকার হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৮)। সুতরাং স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীর হক্ব আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (২৮) : স্ত্রী মারা গেলে তার খালাকে বিবাহ করা যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
ঢাকা।

উত্তর : হ্যাঁ, স্ত্রী মারা গেলে কিংবা বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেলে তার খালাকে বিবাহ করা যাবে। কেননা ফুফুর বর্তমানে ভাতিজিকে এবং খালার বর্তমানে ভাগ্নীকে বিয়ে করা নিষেধ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজিকে এবং খালা ও তার বোনঝিকে একত্রে বিবাহ না করে (ছহীহ বুখারী, হা/৫১০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০৮)।

প্রশ্ন (২৯) : এক মহিলার এক পুরুষের সাথে বিবাহ হয়। কিন্তু সহবাস হওয়ার আগেই তাদের তালাক হয়ে যায়। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার সেই মহিলার অন্যত্র বিবাহ হয়। পরের বিবাহ কি শরীআতসম্মত হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
যশোর।

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত বিবাহ শরীয়তসম্মত হয়েছে। কেননা সহবাস হওয়ার আগেই তালাক হয়ে গেলে সেই মহিলার কোনো ইদ্দত নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করবে; অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। অতএব তাদেরকে কিছু সম্পদ দিবে ও সুন্দরভাবে বিদায় করবে’ (আল-আহযাব ৩৩/৪৯)।

প্রশ্ন (৩০) : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলাকে রক্ত দেয়, তাহলে সেই মহিলাকে বিবাহ করা কি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে?

-আদনান হোসেন
ফরিদপুর।

উত্তর : যেসব কারণে মাহরাম সাব্যস্ত হয় এবং সূরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে যাদেরকে মাহরাম বলা হয়েছে, রক্ত দেওয়া বা নেওয়া সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এর মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং কেউ কাউকে রক্ত দিলে বা কারো থেকে রক্ত নিলে সে তার জন্য মাহরাম হয়ে যাবে না এবং তাকে বিবাহ করাও তার জন্য হারাম হবে না (ফাতওয়া নূরুন আলাদ দারব ইবনু বাব, ২০/২৮৫-২৮৬)।

প্রশ্ন (৩১) : স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন মুরতাদ হয়ে গেলে কি তাদের বিবাহ বলবৎ থাকবে?

-জয়নাল আহমেদ
কুমিল্লা।

উত্তর : স্বামী বা স্ত্রীর কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের বিবাহ আর বলবৎ থাকবে না, বরং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিনা নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়' (সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০/১০)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩২) : জালসার পোস্টার, ব্যানার, হালখাতার কার্ড ইত্যাদি যেগুলো মানুষের সংরক্ষণে থাকে না সেখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম লেখা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-রবিউল ইসলাম
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লেখা যাবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমের বাদশাহ হিরাকলের নিকট চিঠি লেখার সময়ে শুরুতে তিনি লিখেছিলেন, 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৬০)। তবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-এর অবমূল্যায়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে না লেখাই ভালো। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রু-দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন। যাতে তারা কুরআনের অসম্মান না করতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৯০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৫২৯৩)।

প্রশ্ন (৩৩) : বগলের পশম ও নাভির নিচের লোম কতদিন পর কাটতে হয়?

-মিজানুর রহমান
বাগেরহাট।

উত্তর : বগলের পশম ও নাভির নিচের লোম চল্লিশ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হয়। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোঁফ খাট করা, নখ কাটা, বগলের লোম তুলে ফেলা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর তা ৪০ দিনের অধিক ছেড়ে রাখা যাবে না (ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮)।

প্রশ্ন (৩৪) : নবজাতকের জন্মের সময় কানে আযান দেয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত কী?

-আরমান হুসাইন
খুলনা।

উত্তর : নবজাতকের জন্মের সময় কানে আযান দেওয়া সুন্নাত। আবূ রাফে' তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আলীর পুত্র হাসানের কানে ছালাতের আযানের মতো আযান দিতে দেখেছি, যখন ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে জন্ম দেন (তিরমিযী, হা/১৫৫৩)। তবে নবজাতকের জন্মের পরপরই তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনানোর হাদীছ 'মউযূ' বা জাল (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১৭৪)।

সূচিপত্র

প্রশ্ন (৩৫) : নিরুপায় অবস্থায় ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শেরপুর।

উত্তর : নিরুপায় হোক বা না হোক কোনো অবস্থাতেই সূদী ব্যাংক থেকে টাকা লোন নেয়া বৈধ নয়। কারণ সূদ মিশ্রিত সম্পদ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) লা'নত করেছেন সূদখোরের উপর, সূদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষী দুজনের উপর এবং বলেছেন এরা সবাই সমান (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)।

প্রশ্ন (৩৬) : নার্সিং মেয়েদের জন্য অসুস্থ পুরুষ মানুষের সেবা করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-রুফায়দা
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : সাধারণভাবে মেয়েরা মাহরাম নয় এমন পুরুষদের সেবা করতে পারবে না। বরং মেয়েরা মেয়েদের সেবা করবে আর পুরুষরা পুরুষদের সেবা করবে। আর নারী পুরুষের এমন অবাধ মেলামেশা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং মেয়েরা অসুস্থ পুরুষদের সেবা করা থেকে বিরত থাকবে। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে পর্দা ঠিক রেখে তা করতে পারে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)।

প্রশ্ন (৩৭) : আম, লিচু বা যে কোনো ধরনের ফল কতটুকু পরিমাণ বাগানের মালিককে না জানিয়ে খাওয়া যাবে? দলীল সহ জানতে চাই।

-মোঃ মুহির উদ্দীন
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : কোনো বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে কোনো ব্যক্তির যদি সেই বাগানের ফল খাওয়ার খুবই প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বাগানের মালিককে তিনবার ডাকবে। যদি উত্তর পায়, তাহলে মালিকের নিকট থেকে অনুমতি নিবে। আর যদি উত্তর না আসে, তাহলে তার জন্য সেই বাগান থেকে ফল খাওয়া বৈধ। তবে সে কোনো কিছুই বহন করে নিয়ে যেতে পারবে না (শারহুল মুমতে, ৬/৩৩৯)। কেননা নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আর তুমি কোনো ফলের বাগানে পৌঁছে বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতি না করে তা থেকে পেড়ে খাও' (ইবনু মাজাহ, হা/২৩০০)। নবী (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, '(অপরের) বাগানে প্রবেশের পর কোনো লোক তা হতে খেতে পারে কিন্তু পুটুলি বেঁধে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না' (তিরমিযী, হা/১২৮৭)।

প্রশ্ন (৩৮) : কোনো অমুসলিমকে সালাম দেওয়া যাবে কি?

-সানাউল্লাহ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কোনো অমুসলিমকে প্রথমে সালাম দেওয়া যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের প্রথমে সালাম দিও না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৭)। তবে তারা যদি সালাম দেয় তাহলে শুধুমাত্র 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা যখন তোমাদেরকে সালাম দিবে তখন তোমরা বলবে ওয়া আলাইকুম' (ছহীহ বুখারী, হা/৬২৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৩)।

প্রশ্ন (৩৯) : অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করা যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
গাইবান্ধা।

উত্তর : অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। কেননা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য ক্বওমের উদযাপনে শরীক হলো সে গযবের শিকার হবে (সুনানে বায়হাক্বী, হা/১৮৬৪০)। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সেই ক্বওমের সাথেই তার উত্থান ঘটবে (সুনানে বায়হাক্বী, হা/১৮৬৪২)।

তবে মুসলিম দেশে অমুসলিমরা যিম্মী হিসেবে থাকলে, তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করা যাবে।

প্রশ্ন (৪০) : অনেক সময় আমি মন খারাপ থাকলে বা দুশ্চিন্তা আসলে ইলম হাসিলে মনোনিবেশ করি যাতে এর মধ্যে ব্যস্ত থেকে সেগুলো ভুলে যাই। এই নিয়তে ইলম হাসিল করা কি খারাপ? এতে কি ইলম অর্জন করার জন্য নেকী পাব না, কারণ আমার নিয়ত তো দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকা ছিল?

-আব্দুল জব্বার

লালপুর, নাটোর ।

উত্তর : একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শরীআতের জ্ঞানার্জন করতে হবে। এই নিয়তের সাথে সাথে যদি দুনিয়াবী কোনো উপকারের নিয়ত করে, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্য করাতে) কোনো দোষ নেই। যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ করো; যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে’ (আল-বাক্বারা, ২/১৯৮)। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত না রেখে শুধুমাত্র দুনিয়াবী কোনো কল্যাণের জন্য শরীআতের জ্ঞানার্জন করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ইলমের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা যায়, কোনো লোক যদি দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের জন্য তা শিক্ষা করে, তবে সে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না’ (আবূ দাঊদ, হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ, হা/২৫২)। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রেখে দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য শরীআতের জ্ঞানার্জনে কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য যে, এমন সময় দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন দু‘আ পাঠ করবে এবং আল্লাহর যিকির করবে।

প্রশ্ন (৪১) : পুরুষেরা সৌন্দর্যের জন্য রঙিন চশমা পরতে পারবে কি?

-সাকিব আলম

মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : পুরুষদের জন্য সাজসজ্জা হিসেবে তার পৌরুষত্বই যথেষ্ট। স্বাভাবিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য। তবে মেয়েদের মতো মাত্রাতিরিক্ত সাজসজ্জা গ্রহণ করা কখনোই জায়েয নয়। মাত্রাতিরিক্ত সাজসজ্জা মানুষের পৌরুষত্বকে নষ্ট করে দেয়, মেয়েলী স্বভাব তৈরি হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম। এক ব্যক্তি ফাযালাহ ইবনু উবাইদের মাথার চুল উশকোখুশকো দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাত্রাতিরিক্ত সাজসজ্জা করতে নিষেধ করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৪১৬০)। সুতরাং পুরুষদের জন্য রঙিন চশমা ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা উচিত। আর নারীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য চশমা ব্যবহার করলে তা হবে নিঃসন্দেহে শয়তানের কাজ।

প্রশ্ন (৪২) : আমাদের সমাজে অনেকের চুল পেকে গেলে তারা সেগুলো তুলে ফেলে। এমনটি করা কি সঠিক?

-বদিউজ্জামান
ঢাকা।

উত্তর : না, পাকা চুল তুলে ফেলা জায়েয নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পাকা চুল-দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেল না। কেননা কোনো মুসলিম ইসলামের মধ্যে থেকে চুল পাকালে আল্লাহ তার প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি নেকী দান করবেন, একটি মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করবেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন' (আবূ দাঊদ, হা/৪২০২; তিরমিযী, হা/২৮২১)। সুতরাং পাকা চুল তুলে ফেলা যাবে না।

প্রশ্ন (৪৩) : মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম দেওয়া যাবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : না, যাবে না। কেননা একজন কুরআন পড়বে আর আরেকজনের নামে বখশিয়ে দিবে এমন আমল রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব এটি বিদ'আত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমার নির্দেশ নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (৪৪) : গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল মালিককে না বলে খাওয়া যাবে কি?

-মিনহাজুল ইসলাম
ফরিদপুর।

উত্তর : গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া যাবে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি খেজুরটি নিয়ে বললেন, 'আমি ছাদাকার খেজুর বলে আশঙ্কা না করলে খেয়ে নিতাম' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭১)।

প্রশ্ন (৪৫) : দোকানে ব্যাট, বলসহ খেলাধুলার অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করাতে শরীআতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-তারেক হোসেন
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : খেলাধুলার সামগ্রী বিক্রি করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। তবে যদি স্পষ্টভাবে জানা থাকে যে, এগুলো দিয়ে সে হারাম কাজে ব্যবহার করবে, তাহলে তার কাছে এমন সামগ্রী বিক্রি করবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪৬) : সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের ভ্রু তুলে ফেলা কি জায়েয?

-হুমাইরাহ খাতুন
রাজশাহী।

উত্তর : না, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের ভ্রু তুলে ফেলা জায়েয নয়। চোখের ভ্রু তুলে ফেলাতে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা হারাম (ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৮৬)। আর যারা এমন কাজ করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লা'নত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৪১৬৮, ৪১৬৯)। সুতরাং অবশ্যই এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪৭) : যেই ব্যক্তি মহিলাদের পোশাক পরিধান করে, ইসলামে তার বিধান কী?

-আব্দুল জব্বার
কুমিল্লা।

উত্তর : পুরুষদের জন্য নারীদের পোশাক পরিধান করা এবং নারীদের জন্য পুরুষদের পোশাক পরিধান করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেসব পুরুষেরা মহিলাদের পোশাক

পরিধান করে তাদেরকে এবং যেসব মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরিধান করে তাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/৪০৯৮)। আবার এগুলো বিজাতীয় কুসংস্কার মাত্র। আর এই সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)।

প্রশ্ন (৪৮) : খাৎনা করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা ও গানাবাজনা করা সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা কী?

-দাউদ হোসেন
ঝিনাইদহ।

উত্তর : খাৎনা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর অন্যতম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত, তার একটি হচ্ছে খাৎনা করা' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৯)। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা ও গানবাজনা করা শরীআতসম্মত নয়। বরং এগুলো হলো বিজাতিদের থেকে আগত কুসংস্কার, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪৯) : কোনো পিতামাতা তাদের কয়েকটি সন্তানের মধ্যে যদি একটা ছেলে সন্তান অন্যজনকে (নিজের কাউকে যার সন্তান নেই) দিয়ে দেয় এবং সেই ছেলের সরকারি কাগজপত্রে পালিত মাতাপিতার নাম থাকার ফলে তাদের সম্পত্তি পেয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, সেই ছেলে কি তার জন্মদাতা মাতাপিতার সম্পত্তির ভাগ পাবে?

-আরিফ সেখ
ভারত।

উত্তর : সরকারি কাগজপত্রে প্রকৃত পিতামাতার নাম না দিয়ে পালিত পিতামাতার নাম দেওয়া জায়েয নয়। কারণ পালিত সন্তান প্রকৃত সন্তান না, তাছাড়া পালনকারী বাবা প্রকৃত বাবা না। আর জেনেশুনে অন্যকে প্রকৃত পিতা হিসেবে পরিচয় দেওয়া হারাম। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম' (বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩)। সুতরাং পালিত সন্তানকে তার জন্মদাতা পিতামাতার দিকেই সম্পৃক্ত করা হবে, তার পালিত পিতামাতার দিকে নয়। আর যেহেতু তাদেরকে তাদের জন্মদাতা পিতামাতার দিকেই সম্পৃক্ত করা হবে, তাই সেই জন্মদাতা পিতামাতা মারা গেলে এই সন্তানও তাদের সম্পদে ভাগ পাবে (আন-নিসা, ৪/১১)। আর লালন-পালনকারী বাবা-মা যদি চায় তাহলে তাদের পালক সন্তানের জন্য সম্পদ অছীয়ত করে যেতে পারে।

দিয়াত

প্রশ্ন (৫০) : কেউ যদি কাউকে ভুলবশত হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর করণীয় কী?

-আব্দুস সামাদ
চট্রগাম।

উত্তর : কেউ কোনো মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করলে, হত্যাকারীকে একটি মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির পরিজনকে রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে শুধু একটি মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে, রক্তপণ দিতে হবে না। আর যদি নিহত ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে রক্তপণ দিতে হবে এবং একটি মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। আর যদি এমনটি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে হবে (আন-নিসা, ৪/৯২)।

তুবা পাবলিকেশন কতৃক প্রকাশিত বইসমূহ

কেন হব অবরোধবাসিনী ?
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
▪ পৃষ্ঠা : ২৪০ ▪ মূল্য : ১৪০ টাকা

শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
▪ পৃষ্ঠা : ১৬৮ ▪ মূল্য : ৯০ টাকা

মরণ একদিন আসবেই
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▪ পৃষ্ঠা : ২৮৮ ▪ মূল্য : ১৫০ টাকা

রাসুল (ছা.)-এর ছালাত বানাম প্রচিলিত ছালাত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▪ পৃষ্ঠা : ৩৯২ ▪ মূল্য : ২২০ টাকা

হজ্জ ও উমরা
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▪ পৃষ্ঠা : ১২৮ ▪ মূল্য : ৯০ টাকা

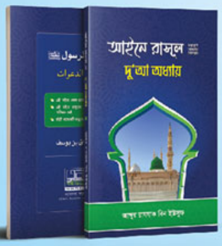

আইনে রাসুল (ছা:) দু'আ অধ্যায়
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▪ পৃষ্ঠা : ২০৮ ▪ মূল্য : ১৩০ টাকা

পোশাক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▪ পৃষ্ঠা : ৯৬ ▪ মূল্য : ৭৫ টাকা

উপদেশ
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▪ পৃষ্ঠা : ৪৫৬ ▪ মূল্য : ২৫০ টাকা

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন

তুবা পাবলিকেশন TUBA PUBLICATION

রাজশাহী নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
বিকাশ, নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

Monthly Al-Itisam الاعتصام 7th Year, 9th Part, July 2023, Price : 30.00

মাকতাবাতুস সালাফ

কর্তৃক প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!

(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)

সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

▪ পৃষ্ঠা : ৫১২ ▪ মূল্য : ৫০০ টাকা

ইলমুল হাদীস বিষয়ে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.), তার অগাধ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হলো সিলসিলা ছহীহা। এতে তিনি হাদীছের মহাসমুদ্র তালাশ করে দুর্লভ মণিমুক্তাসমূহ সন্নিবেশ করে দিয়েছেন, যা মুসলিম উম্মাহর বহু অজানা হাদীছ জানার খোরাক মেটাবে।

কুরআনের ধারক-বাহকদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আজুর্রী, আল-বাগদাদী (রাহি)

সংক্ষিপ্তকারক: ড. খালিদ ইবনু উছমান আস সাবত (হাফি)

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

▪ পৃষ্ঠা : ৭২ ▪ মূল্য : ৭০ টাকা

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

মূল : আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (রাহি)

ভাষান্তরে: আবু আব্দুর রঊফ আব্দুল কাদের বিন রঈসুদ্দীন

▪ পৃষ্ঠা : ৩৬ ▪ মূল্য : ৩০ টাকা

ওহে সুন্নাহর অনুসারীগণ! পরস্পরের প্রতি কোমল হোন

আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামাদ আল আব্বাদ আল বাদ্‌র হাফিযাহুল্লাহ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

▪ পৃষ্ঠা : ১০৪ ▪ মূল্য : ১০০ টাকা

আল্লাহ যাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না

সাঈদুর রহমান

সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

▪ পৃষ্ঠা : ৬৪ ▪ মূল্য : ৬০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭